প্রমীলা।

["মেঘনাদ বধ" কাব্য অবলম্বনে]

শ্রীঅবনীকান্ত সেন সাহিত্যবিশারদ

প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ

সন ১৩২১ সাল।

সর্ব্ব স্বত্ব সংরক্ষিত] [মূল্য এক টাকা মাত্র।

কলিকাতা-ভবানীপুর
২৬নং কাঁসারীপাড়া রোড "বার্ত্তাবহ-প্রেসে"
শ্রীবামাচরণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উৎসর্গ-পত্র।

আমার

মাতৃ-কল্পা

সোণার বাঙ্গালার

কুসুম-কোমলা কামিনীকুলের

সুকোমল,

কর-কমলে,

"প্রমীলা"

উৎসর্গীকৃত

হইল।

—গ্রন্থকার—

উপহার-পত্র।

আমার

শ্রী

এই

"প্রমীলা"

গ্রন্থ খানি

অর্পণ

করিলাম।

ইতি,—

তারিখ

শ্রী

ভূমিকা।



কবিকুলগুরু মহর্ষি বাল্মীকির অপূর্ব্ব সৃষ্টি—রামায়ণ, জাহ্নবী-ধারার ন্যায়—ভারত, এবং জগৎ প্লাবিয়া বহিয়া গিয়াছে। উহার সুধাধারার তীরে বসিয়া কত কবি আপন আপন উদ্যান রচনা করিয়াছেন। কাহারও উদ্যানে সূর্য্যমুখী, কাহারও উদ্যানে জাতি যূথী, কাহারও উদ্যানে গোলাপ ফুটিয়াছে। অনেক মহাকবিই জাহ্নবীর উন্মুক্ত তটে উদ্যান রচনা করিয়াছেন, কিন্তু, এক যুগে কবিসূরী ভবভূতি এবং আর এক যুগে,—বঙ্গকবিশিরোমণি শ্রীমধু ফুল ও লতার প্রাচীরে ঘিরিয়া যে অপূর্ব্ব সুন্দর উদ্যান সাজাইয়াছেন, জগৎ তাহা দেখিয়া পুলকিত ও বিস্মিত হইয়াছে।

"উত্তর-চরিত" ভবভূতির শ্রেষ্ঠ রচনা এবং "মেঘনাদবধ-কাব্য" শ্রীমধুর শ্রেষ্ঠ কাব্য। ছায়া-সীতায় ভবভূতি অনন্ত সৌন্দর্য্য ঢালিয়া দিয়াছেন, শ্রীমধু দিয়াছেন,—প্রমীলায়। এই দুইটি চিত্রই দুই কবির দুই অভিনব উদ্যানের বিশেষত্ব এবং এই দুইয়ের দ্বারাই দুই কবির অতুল উদ্যান জগতে এত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। শুধু তাই নহে, এই দুইয়ের জন্যই দুই কবির সগর্ব্ব নিপুণ রচনা সার্থক।

নবযুগের বঙ্গ যে জন্য মধুকে কবিমণ্ডলীর শ্রেষ্ঠ আসনে বসাইয়াছেন, প্রমীলাচিত্রের অঙ্কন তাহার অন্যতর—প্রধান কারণ। প্রমীলা শ্রীমধুর কাব্য-উদ্যানের গোলাপ,—গন্ধে, বর্ণে, সৌন্দর্য্যে। বঙ্গের পরবর্ত্তী কাব্যসমূহে যে বিচিত্র গোলাপ ফুটিয়াছে, প্রমীলা তাহার আদি।

সাহিত্যের সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া যেমন, সমাজের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও, শ্রীমধুর

কবির কর্ত্তব্য—অতি চমৎকার ভাবে সুসম্পাদিত হইয়াছে। "মেঘনাদ-বধের" গোলাপ-বনে, কাঁটার আঘাতটুকু সহিয়া যাঁহারা যাইতে পারিয়াছেন এ সাক্ষ্য তাঁহারাই দিবেন। বাঙ্গালীর গৌরব-উদ্যানের শ্রেষ্ঠ পুষ্পের এই নব সৌরভে ও নবীন সৌন্দর্য্যে তাঁহারা বিভোর হইয়া আছেন।

কিন্তু, লতার প্রাচীরে কোথায় যে দ্বার, তাহার উদ্দেশ আজ পর্য্যন্তও দেশের সর্ব্বসাধারণের অনেকেই পান নাই। যাঁহারা উদ্দেশ পাইয়া উদ্যানে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে কাঁটার আঘাত আছে দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, গন্ধটুকু তাঁহাদের প্রাণে অপার আকুলতার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে, সৌন্দর্য্য উপভোগ তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে নাই।

• • •

জগদ্বন্দিতা সীতার পাশে মধুর প্রমীলাচরিত্র অমর মধুর মধুসৃষ্টি। কাল, দেশবাসীকে ইহার রস উপভোগ হইতে কতদিন দূরে রাখিতে পারে?

যুগে যুগে মহাকবিগণের সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ চরিত্র সমূহ মানবের মর্ম্ম-মন্দিরের আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছে।—যাঁহারা সৌন্দর্য্যবেত্তা,—যাঁহারা সাধক, তাঁহারাই মানবের হৃদয়-মন্দির পর্য্যন্ত এ পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যের সুধা সকলকে বাঁটিয়া পান করাইবার যে পুণ্য, আপনি তৃপ্ত হওয়ার চাইতে সে পুণ্য অনেক বড়,—সে পুণ্য অসীম।

সাহিত্যবিশারদ স্নেহাস্পদ অবনীকান্ত এই পুণ্য লাভের উদ্যম করিয়াছেন। বাঙ্গালার অতুল গৌরবের স্মরণীয় যুগের শ্রেষ্ঠ অধ্যায় তিনি দেশের সম্মুখে খুলিয়া লইয়াছেন,—মহাকবির কাব্যোদ্যানের গোলাপটি তিনি হৃদয়ের আবেগে তুলিয়া আনিয়াছেন।

তাঁহার এ হৃদয়ের, প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না, তাঁহার এ উদ্যমের প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না।

দুঃসাধ্য না হইলেও তাঁহার এ কাজে অভিনবত্ব আছে। তিনি যে পথ বাছিয়া লইয়াছেন তাহাতে তাঁহার প্রাণের এবং সৎবিবেচনার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা মধুর অমর মাধুর্য্য দেশের সকল প্রাণে ঠাঁই পাইবে।

অবশ্য "মেঘনাদ-বধের" কতকগুলি বিষয় লইয়া নানারূপ মতান্তর আছে। ভবভূতির "উত্তর চরিত" লইয়াও আছে। "মেঘনাদ বধের" ঐ সব সমস্যার সমাধানে স্বতন্ত্র প্রতিভার আবশ্যক। অবনীকান্ত সে পথে যান নাই। না গিয়া ভালই করিয়াছেন। সে জন্য তাঁহাকে দোষ না দিয়া এই বলিতে পারি,—মধুকে তিনি মধুর দ্বারাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং মধুর সার সৌন্দর্য্যের চয়নে প্রাণের ব্যগ্রতাকেই তিনি প্রধান স্থান দিয়াছেন।

প্রমীলা চরিত্রে নারীজাতির সকল গুণ ও গৌরব একত্রে মিলিয়া প্রস্ফুটিত হইয়াছে। সীতা-

সাবিত্রীর দেশে মধুর এ চিত্র যে কি চমৎকার সুন্দর, বঙ্গের অন্তঃপুরের সহস্র প্রাণ এইবার নিষ্কণ্টকে তাহার পরিচয় পাইবে।

বাঙ্গালার গৌরব-উদ্যানের লতা-প্রাচীরের দ্বার-সন্ধান অতঃপর এইরূপে সহজ হইয়াই আসিবে। গ্রন্থকার কাঁটা ফেলিয়া যে গোলাপ—বিবিধ শোভন পল্লবের মধ্য-পুষ্প করিয়া সকলের কাছে আনিয়া ধরিয়াছেন,—নির্ভয়ে তাহার সৌরভ ও সৌন্দর্য্য পান করিয়া বঙ্গবাসী মাত্রেই তাঁহাকে অন্তরের অজস্র আশীর্ব্বাদে ধন্য করিবেন। ইতি,

কলিকাতা
১লা আশ্বিন, ১৩২১

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার

গ্রন্থকারের নিবেদন।

কবিবর শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার মহোদয়ের "ভূমিকা"রূপ যে গৌরব-মুকুট পরিয়া "প্রমীলা" বাহির হইল,—তাহার উপব গ্রন্থকারের নিবেদনে আর অধিক বলিবার কি আছে? কিন্তু নিবেদনে নীরবতা পাছে দাম্ভিকতারই রূপান্তর বলিয়া পরিগণিত হয়, সেই ভয়ে এই স্থানে দুইচারিটী মাত্র কথা নিবেদন করিব।

মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের "মেঘনাধ বধ" কাব্যাবলম্বনে "প্রমীলা" লিখিত হইল। প্রমীলার চরিত্রে বঙ্গীয় ললনা মাত্রেরই যথেষ্ট শিক্ষণীয় বিষয় আছে মনে করিয়া সম্প্রতি তাঁহাদিগের পাঠোপযোগী সরল ও সহজ-বোধ্য গদ্যে এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিলাম। মাইকেলের অনুসরণে গ্রন্থখানি লিখিত হইলেও স্থানে স্থানে আমাকে স্বতন্ত্র কল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে। গ্রন্থখানি সরল ও সুখপাঠ্য করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। বাঙ্গালার একটী ললনাও যদি "প্রমীলা" পাঠে সুখী হন, তবেই স্বকীয় শ্রমের সার্থকতা উপলব্ধি করিব।

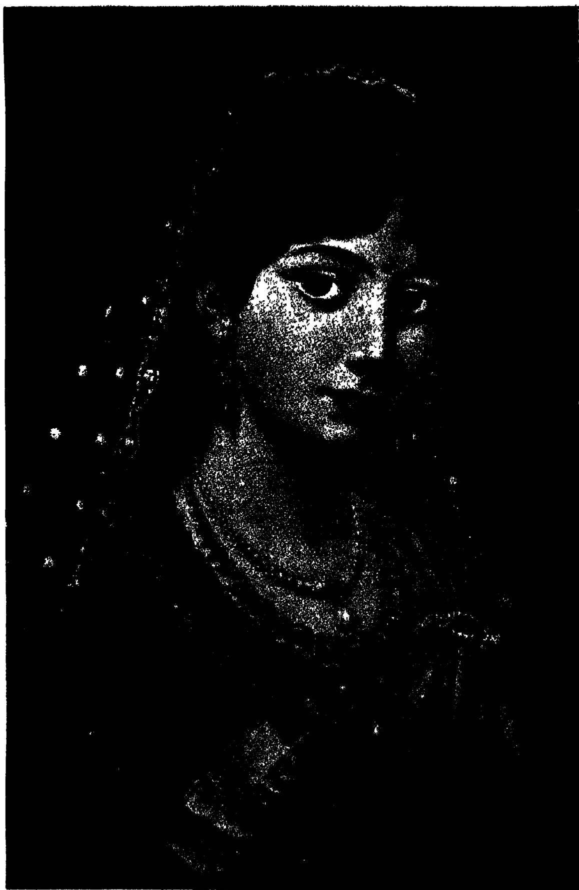
উপসংহারে বক্তব্য এই যে, সাময়িক পত্র সম্পাদনের গুরুভার স্কন্ধে লইয়া গ্রন্থ প্রণয়ন এক বিশেষ দুরূহ ব্যাপার। গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশোপযোগী যথেষ্ট অবকাশের অভাব নিবন্ধন গ্রন্থের স্থানে স্থানে ক্রটী-বিচ্যুতি সংঘটিত হওয়া অসম্ভব নহে। আশা করি, সহৃদয় পাঠকপাঠিকাগণ গ্রন্থকারের এই অনিচ্ছাকৃত ক্রটী নিজ গুণে মার্জ্জনা করিবেন। এই গ্রন্থে যে একটী সঙ্গীত সংযোজিত হইয়াছে, উহা শ্রদ্ধেয় ভূমিকা-লেখক মহোদয়ের "হৃদয়-সঙ্গীত" নামক অপ্রকাশিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি হইতে তাঁহার অনুমতি গ্রহণে গ্রহণ করিয়াছি। ইতি,

কলিকাতা।
ভবানীপুর-বার্ত্তাবহ-আফিস
২রা আশ্বিন, ১৩২১ সন।

বিনীত—
শ্রীঅবনীকান্ত সেন।

সূচী-পত্র।





প্রমীলা সুন্দরী

শিশু প্রেস

প্রমীলা

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রমীলার জন্ম ও বাল্যকাল।

সাগর-চুম্বিত স্বর্ণলঙ্কার অনতিদূরে প্রকৃতির প্রমোদ-নিকেতন স্বরূপ সুরম্য সুমাত্রা দ্বীপ। অতি প্রাচীন কালে কালনেমী নামে এক বিখ্যাত দৈত্য এই দ্বীপের অধিপতি ছিলেন।

কালনেমী সর্ব্বগুণসম্পন্ন রাজা। তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য— বিপুল ধনৈশ্বর্য্য— অশেষ প্রতাপ। কালনেমী আপনার বাহুবলে বিশ্ব জয় করিতে পারিতেন। স্বর্গে দেবরাজ পর্য্যন্ত তাঁহার ভয়ে কম্পান্বিত রহিতেন।

তাঁহার রাজ্য সুশাসিত ছিল। রাজ্যের প্রজাবৃন্দের মধ্যেও কোনরূপ অসুখ-অশান্তি পরিলক্ষিত হইত না। সেই বিশাল সাম্রাজ্যের ঘরে ঘরে সুখ-শান্তি বিরাজ করিত।

রাজা ও রাণী উভয়েই প্রজাবৃন্দের সুখ-সুবিধার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। প্রজারাও রাজা-রাণীকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত। মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীরূপিণী রাণী রম্ভাবতী অশেষ-গুণালঙ্কৃত দৈত্যরাজ কালনেমীর উপযুক্ত মহিষী ছিলেন। রাণীর দয়া-স্নেহের কাহিনী রাজ্যের ঘরে ঘরে কীর্ত্তিত হইত।

এই বিশাল সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই সুখ-শান্তি বিরাজিত ছিল বটে, কিন্তু রাজারাণীর মনে সুখ ছিল না। কেন না,—রাজা-রাণী তখনও নিঃসন্তান। এজন্য উভয়েই প্রাণে বড় বিষণ্ণ ছিলেন।

রাজারাণীর এই মানসিক দুঃখে রাজ্যের প্রকৃতিপুঞ্জও অতিশয় দুঃখিত ছিল।

অবশেষে অমাত্যবর্গের পরামর্শে দৈত্যরাজ এক পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। দেশ-দেশান্তর হইতে বহু পণ্ডিত-পুরোহিত আমন্ত্রিত হইয়া এই যজ্ঞানুষ্ঠানে যোগদান করিলেন। মহা সমারোহে যজ্ঞারম্ভ হইল। সমগ্র রাজ্যে আনন্দ-কোলাহল উঠিল। যজ্ঞ শেষ হইলে, রাজা-রাণী পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত পবিত্র যজ্ঞান্ন ভক্ষণ করিলেন। একদিন নিশাবসানে রাণী স্বপ্ন দেখিলেন,—জগজ্জননী ভবানী যেন সস্নেহে তাঁহার হস্তধারণ করিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন,—"বৎসে, তোমাদিগের এইরূপ নিয়ম-নিষ্ঠা ও কঠোর যজ্ঞানুষ্ঠান-ব্রতে আমি বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। আমার আশীর্ব্বাদে তোমার গর্ভে সর্ব্বগুণ-সম্পন্না, পরম রূপবতী ও তেজস্বিনী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিবে। কন্যা হইবে বলিয়া দুঃখ করিও না। এই কন্যার অলৌকিক রূপলাবণ্য ও সতীত্ব-গুণ-গরিমায় তোমাদিগের দৈত্যবংশের মুখ চিরকালের জন্য উজ্জ্বল হইয়া

রহিবে।" এই বলিয়া ভবানী অন্তর্হিতা হইলেন। ঠিক এই সময়ে দৈত্যরাজ কালনেমীও অনুরূপ স্বপ্ন দর্শনে জাগিয়া উঠিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। রাজারাণী গাত্রোত্থান করিলেন। উভয়েই শশব্যস্তে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত পরস্পরের নিকট ব্যক্ত করিয়া হৃদয়ে পরম আনন্দ অনুভব করিলেন। উভয়েরই মুখ ও চক্ষু হর্ষোৎফুল্ল হইল। যথাসময়ে দৈত্যরাজ রাজসভায় গিয়া অমাত্যবর্গের নিকট স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। অমাত্যবর্গের আনন্দ-কোলাহলে রাজসভা মুখরিত হইয়া উঠিল।

সময়ে রাণী গর্ব্ভবতী হইলেন। রাণীর গর্ব্ভ-লক্ষণ সন্দর্শনে রাজার আনন্দের আর সীমা রহিল না। যথাকালে রাণী নন্দনের পারিজাতের মত এক অপরূপ কন্যারত্ন প্রসব করিলেন। কন্যার রূপে সমস্ত রাজপুরী আলোকিত হইল। রাজ্যময় জন্মোৎসবের এক মহা ঘটা পড়িয়া

গেল। কালনেমী কন্যার মুখচ্ছবি সন্দর্শনে একবারে আনন্দ-সাগরে ডুবিয়া গেলেন। দরিদ্র-দিগকে রাজ-ভাণ্ডার হইতে প্রচুর অর্থ দান করিবার আদেশ প্রদান করা হইল, কারাধ্যক্ষ অসংখ্য কয়েদীকে মুক্তি দান করিবার আদেশ পাইলেন। কারামুক্ত কয়েদীরা কৃতজ্ঞ চিত্তে রাজারাণীর জয়ধ্বনি করিতে লাগিল এবং ভগবানের নিকট যুক্তকরে নবজাত শিশুর মঙ্গল কামনা করিয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিল। শিশু শুক্লপক্ষীয় শশি-কলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। জ্যোৎস্নার উদয়ে যেমন রজনীর গাঢ় অন্ধকার দূরীভূত হয়, রাজ-কন্যার আবির্ভাবেও তেমনই সেই বিশাল রাজপুরীর বিষাদ-অন্ধকার দূরীভূত হইল। দৈত্যরাজ আদর করিয়া কন্যার নাম রাখিলেন,—প্রমীলা।

প্রমীলার শৈশবকাল অতিক্রান্ত হইল। রাজ-কন্যা পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিলেন। দৈত্যরাজ এক শুভদিন দেখিয়া, কন্যার "হাতে-খড়ি"

দেওয়াইলেন। বালিকা ধূলি-খেলা ছাড়িয়া এক্ষণে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করিলেন। অল্পকালের মধ্যেই বালিকা নানা শাস্ত্রে পারদর্শিনী হইলেন। দৈত্যরাজ প্রমীলার লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিত্র ও সঙ্গীত-বাদ্য শিক্ষারও সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। প্রমীলা সকল বিষয়েই অপূর্ব্ব নিপুণতার পরিচয় দিয়া সকলকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন।

কালনেমীর এক বৃদ্ধ সৈন্যাধ্যক্ষ ছিল ; তাঁহার নাম তালজঙ্ঘ। তালজঙ্ঘ অতি পুরাতন এবং বিশ্বস্ত সেনাপতি। বহু যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া বৃদ্ধ তালজঙ্ঘ দিগ্বিজয়ী বীর বলিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তালজঙ্ঘ রাজকন্যাকে আপন কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন। প্রমীলা অবসর সময়ে প্রতিদিন এই বৃদ্ধ সেনাপতির নিকট যুদ্ধ-বিদ্যাও অভ্যাস করিতেন। বালিকা কিছু দিনের মধ্যেই শাস্ত্র-বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে শস্ত্র-বিদ্যায়ও বিশেষ সুনিপুণা হইয়া উঠিলেন।

পূর্ব্বকালে এ দেশের রাজ-কন্যাদিগের এক একজন সখী বা সহচরী থাকিত এবং রাজকন্যাগণের এই সকল সহচরীদিগকেও নানাবিধ জ্ঞান-গুণে বিভূষিতা হইতে হইত। কালনেমী পরম রূপগুণ-সম্পন্না তাঁহার এক মন্ত্রীকন্যাকে আপন কন্যার সহচরীপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রমীলার এই সখীটীর নাম ছিল, বাসন্তী। বাসন্তী বয়সে ও রূপে গুণে প্রায় প্রমীলার অনুরূপ ছিলেন। প্রমীলার সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার সহচরী বাসন্তীও শাস্ত্র ও শস্ত্র বিদ্যাদিতে সুনিপুণা হইয়া উঠিলেন।

দেখিতে দেখিতে প্রমীলা কিশোর জীবনে পদার্পণ করিলেন। প্রমীলার বয়স এক্ষণে দশ। প্রমীলার রূপের ছটায় চারিদিক আলোকিত হইয়া উঠিল। প্রমীলার রূপের আর তুলনা হয় না। জ্যোৎস্নার ন্যায় তাঁহার গায়ের রং, পূর্ণচন্দ্রের মত তাঁহার মুখমণ্ডল, প্রশস্ত ললাট, কুঞ্চিত কেশদাম, কচি দাড়িম্ব-দানার ন্যায় সুশুভ্র দন্ত পংক্তি, সঙ্কু-চিত রক্তপদ্মদলের ন্যায় অধরোষ্ঠ, তিল ফুলের

ন্যায় সুন্দর নাসিকা, মরাল-নিন্দি-গ্রীবা। প্রমীলার কণ্ঠ সুধাময়, চক্ষু করুণাময়, বক্ষ মমতাময়। প্রমীলার স্নেহ-মমতায় বনের পশু পক্ষী পর্য্যন্ত তাঁহার বশীভূত হইয়া উঠিল। বালিকা প্রমীলা এই বয়সেই দেব-কন্যা বলিয়া পরিচিতা হইলেন।

প্রমীলার জন্মদিন উপলক্ষ্যে একদিন দৈত্য-রাজ্যে বিশেষ ঘটা। এই মহোৎসব দিনে বহু কয়েদী কারামুক্ত হইল, বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা উদর পূর্ণ করিয়া রাজপ্রাসাদে মিষ্টান্ন ভোজন করিল, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ রাশি রাশি অর্থ পাইলেন, আর রাজ্যের সমস্ত কাঙ্গালীকে অর্থ ও বস্ত্র দান করিবার ব্যবস্থা হইল।

এই দিন অপরাহ্নে রাজ-বাটীর বহির্ভাগে অর্থ ও বস্ত্রপ্রত্যাশী হইয়া সহস্র সহস্র কাঙ্গালী সমাগত হইতে লাগিল। কর্ম্মচারীরা একে একে কাঙ্গালী-গণকে বিদায় করিতে লাগিলেন। রাজকন্যা প্রমীলা ও তাঁহার প্রিয় সখী বাসন্তী উচ্চ রাজ-প্রাসাদ-

শিখরে আরোহণ করিয়া অভিনিবেশ সহকারে কাঙ্গালী-বিদায়-কার্য্য পরিদর্শন করিতে লাগিলেন।

প্রমীলা দেখিলেন, অতি মলিন ও জীর্ণ বস্ত্র-পরিহিতা এক কাঙ্গালিনী, একটি শিশুসন্তান বুকে লইয়া, এক জীর্ণকায় অন্ধের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ভিক্ষা-লাভের আশায়, সেই ভিড়ের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে ; কিন্তু কিছুতেই সেই জনতা ভেদ করিয়া অগ্রসর হইবার পথ পাইয়া উঠিতেছে না।

রাজকন্যার কোমল হৃদয় দুঃখীর দুঃখে গলিয়া গেল। বালিকা স্ত্রীলোকটীর এইরূপ শোচনীয় অবস্থা পরিদর্শন করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সখী বাসন্তীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"সই, ঐ দেখ, এক কাঙ্গালিনীর কি বিপদ, দুঃখিনী একটি কচি শিশু বুকে লইয়া এক অন্ধের সহিত ঐ ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু কোন ক্রমেই অগ্রসর হইবার পথ না পাইয়া, এক্ষণে ক্ষুণ্ণ মনে চলিয়া যাইতেছে!

তুই এখনই আমাদের পরিচারিকা নৃমুণ্ডমালিনীকে ঐ স্থানে পাঠাইয়া দিয়া ঐ কাঙ্গালিনীকে আমার কাছে লইয়া আয়।”

বাসন্তী তৎক্ষণাৎ তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিলেন এবং পরিচারিকা নৃমুণ্ডমালিনীকে ঐ স্থলে পাঠাইয়া দিলেন। পরিচারিকা অতি যত্নের সহিত ঐ কাঙ্গালিনী ও অন্ধটীকে রাজপুরীতে লইয়া আসিল। প্রমীলাও প্রাসাদ-শিখর হইতে তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিয়া হাতে ধরিয়া স্ত্রীলোকটীকে বসাইলেন। সস্নেহে কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন—অন্ধ লোকটী ঐ কাঙ্গালিনীরই স্বামী। ভিক্ষাই তাহাদের উপজীবিকা। প্রমীলা স্ত্রীলোকটীর দুঃখ-কাহিনী মনোযোগ দিয়া শুনিলেন।

শেষে স্ত্রীলোকটীর হস্তে দুইখানি নূতন বস্ত্র ও দুইটী স্বর্ণমুদ্রা দিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিলেন। কাঙ্গালিনী যেন হাতে স্বর্গ পাইল। কাঙ্গালিনী

রাজকন্যাকে কহিল—"মা, তুমি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, রাজার পুত্রবধূ হও; আর আশীর্ব্বাদ করি,—তুমি চিরায়ুষ্মতী হইয়া আমাদের মত দুঃখী কাঙ্গালের মাতৃরূপে বিরাজ কর।"

আর একদিন অপরাহ্নে প্রমীলা তাঁহাদের উদ্যান-বাটীকার মধ্যে এক সরোবরের তীরে সুরম্য সোপানোপরি উপবেশন করিয়া,—ফুলের মালা গাঁথিতেছেন। সখী বাসন্তী কুঞ্জ হইতে বাছিয়া বাছিয়া তাঁহাকে ফুল তুলিয়া দিতেছেন, এমন সময় একটী অপূর্ব্বরূপী পক্ষী ঘোর আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বাণ-বিদ্ধাবস্থায় প্রমীলার সম্মুখে পতিত হইল। বালিকা প্রমীলা ফুলের মালা দূরে ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ পাখীটীকে সযত্নে আপনার কোলে তুলিয়া লইলেন। বাসন্তী তদ্দণ্ডেই সরোবর হইতে অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া শীতল জল লইয়া আসিলেন। প্রমীলা বিশেষ সাবধানে পক্ষীর গাত্র হইতে বাণ খুলিয়া লইলেন এবং পাখীর ক্ষত স্থান শীতল জলে ধৌত করিয়া, উহার সেবায় নিযুক্ত হইলেন।

পক্ষীর করুণ আর্ত্তনাদে প্রমীলার দুই চক্ষু দিয়া দর-দর ধারায় অশ্রু পড়িতে লাগিল। কিন্তু প্রমীলা একটীও কথা কহিলেন না। নীরব অক্লান্ত সেবায় পক্ষীটীকে কতকটা সুস্থ করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে রাজ্যের একজন সৈনিক ধনুর্ব্বাণ হস্তে সেই সরোবর তীরে উপস্থিত হইয়া রাজ-কন্যাকে অভিবাদন করিল। সৈনিক নিজের কার্য্যে লজ্জিত হইয়া কহিল,—"মা, আপনার পরিচ্ছদের জন্য অত্যুৎকৃষ্ট পালক সংগ্রহ করিব মনে করিয়া আজ পক্ষী শিকারে বাহির হইয়াছিলাম। এই অভিনব স্বর্ণবর্ণ পালক-সমন্বিত পক্ষীটীকে দেখিয়া আমি উহার প্রতি তীর নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, কিন্তু পক্ষীটী তীর সহিতই উড়িয়া আসিয়াছে।" রাজ-কন্যা গম্ভীর ও প্রশান্ত দৃষ্টিতে সৈনিকের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"আমার পোষাকের জন্য তোমরা আর কেহই কখনও পাখী শিকার করিও না।" সৈনিক সসম্ভ্রমে রাজকন্যাকে অভিবাদন

করিয়া চলিয়া গেল। সৈনিকের জীবনে এমন পরিবর্ত্তন ঘটিল যে,—অবশিষ্ট সমগ্র জীবনে সে আর শিকারে বাহির হইল না।

প্রমীলা দুই তিন দিন পর্য্যন্ত পাখীটাকে কত আদর যত্নে সেবা করিলেন। তারপর পাখীটী সম্পূর্ণ সুস্থ হইবামাত্র তিনি বনের পাখীটীকে বনে ছাড়িয়া দিলেন। পাখী বালিকার অপূর্ব্ব বিশ্ব-প্রীতির মধুর স্মৃতি বুকে লইয়া উধাও হইয়া উড়িয়া গেল।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রমীলার বিবাহ।



প্রমীলা আর সে বালিকাটী নাই। প্রমীলা এক্ষণে যৌবনের প্রথম সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রূপ ও গুণ দুই-ই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রাজকন্যা সর্ব্বশাস্ত্রেই সুনিপুণা হইলেন। চিত্র ও সঙ্গীত-বিদ্যায় তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা জন্মিল।

একদিন দেবর্ষি নারদ আকাশ-পথে গমন করিতে করিতে কালনেমীর প্রাসাদ-প্রকোষ্ঠ হইতে এক অপূর্ব্ব মধুর সঙ্গীত-রব শুনিতে পাইয়া মুগ্ধ হইলেন। মুনিবর ভূতলে অবতরণ করিয়া দৈত্য-রাজ কালনেমীর সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

দৈত্যরাজ মহর্ষিকে পরম সমাদরে রত্নাসনে বসাইয়া তাঁহার কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। মহর্ষি নারদ কহিলেন,—“মহারাজ, আপনার রাজ-প্রাসাদ হইতে আজ এক অপূর্ব্বমধুর সঙ্গীত-রব শ্রবণ করিয়া একান্তই মুগ্ধ হইয়াছি। আমার প্রার্থনা,—ঐ সঙ্গীতটী আর একবার শ্রবণ করি।”

দৈত্যরাজ নীরবে মনে মনে প্রফুল্ল হইতে লাগিলেন। তৎক্ষণাৎ দৈত্যরাজ কন্যাকে রাজ-সভায় আসিবার জন্য আদেশ করিয়া পাঠাইলেন।

রাজ-কন্যা পিতার আদেশে রাজ-সভায় আসিয়া মহর্ষিকে ও পিতাকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মানা রহিলেন। মহর্ষি প্রমীলাকে “চিরায়ুষ্মতী ও পতিসোহাগিনী হও”, বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। দৈত্যরাজ কন্যাকে কহিলেন,—“মা, তুমি এই মাত্র যে কি একটী সুন্দর গান গাইতেছিলে, সেই গানটী একবার শুনিবার জন্য মহর্ষির একান্ত কৌতূহল হইয়াছে। সেই গানটী মহর্ষিকে শুনাইয়া তাঁহার আনন্দ বর্দ্ধন কর।”

প্রমীলা পিতৃ-আজ্ঞায় বীণাযন্ত্র লইয়া গান ধরিলেন। বালিকার সেই সুধাকণ্ঠনিঃসৃত অপূর্ব্ব সঙ্গীত-রবে সমগ্র রাজপুরী মুখরিত হইয়া উঠিল।

সঙ্গীত শেষ হইলে প্রমীলা আবার মহর্ষি ও পিতাকে প্রণাম করিলেন এবং পিতার অনুমতি লইয়া অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন। নারদ দৈত্য-রাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"মহারাজ, আপনার কন্যার ন্যায় এরূপ অলৌকিক রূপ-লাবণ্যময়ী ও অপূর্ব্ব গুণ-সম্পন্না কন্যা ত্রিভুবনে দুর্ল্লভ। রাজন্, আপনার কন্যা যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে, ইহাকে এক্ষণে একটী উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করিয়া সুখী হউন।" দৈত্যরাজ মহর্ষির কথায় আনন্দিত হইয়া কহিলেন,—"দেবর্ষি, ত্রিভুবনে আপনার ন্যায় সূক্ষ্মদর্শী ও সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিত একান্ত বিরল। অতএব আমার বিনীত প্রার্থনা,—আপনি আমার এই একমাত্র স্নেহ-পুত্তলীর জন্য একটী উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করিয়া দিয়া আমাকে আনন্দিত ও আপ্যায়িত করুন।"

মুনিবর "তথাস্তু" বলিয়া, বিদায় লইলেন।

রাজকন্যা প্রমীলা ক্রমে পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। প্রমীলার রূপ এক্ষণে আর তাঁহার দেহে যেন ধরে না। বর্ষা-সমাগমে নদীর জল যেমন কূলে কূলে উছলিয়া উঠে, যৌবন সমাগমেও প্রমীলার রূপ তেমনই যেন উছলিয়া পড়িতে লাগিল। বসন্ত সমাগমে বনের লতা যেমন পুষ্প-মুকুলে বিকশিত হইয়া সমগ্র বন আলোকিত করিয়া তুলে, রাজকন্যাও তেমনই আপনার সন্ত যৌবন-সুলভ রূপের ডালি লইয়া সমগ্র রাজপুরী আলোকিত করিয়া তুলিলেন।

রাজা-রাণী উভয়েই প্রমীলার বিবাহের জন্য উদ্‌গ্রীব হইলেন। উপযুক্ত রাজপুত্রের অনুসন্ধানে দেশে দেশে লোক ছুটিল।

এদিকে ত্রিভুবন-বিজয়ী রাক্ষসরাজ রাবণ তখন স্বর্ণলঙ্কার স্বর্ণ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। রাবণ অতুল ধনৈশ্বর্য্যের অধিপতি এবং দুর্দ্দণ্ডপ্রতাপ বীর।

রাবণের রাজত্ব কালেই লোকে লঙ্কাকে স্বর্ণলঙ্কা নামে অভিহিত করিয়াছিল। রাবণ-নন্দন মেঘনাদ তখন লঙ্কার যুবরাজ। মেঘনাদের অপূর্ব্ব বীরত্ব ও গুণ-গরিমার কথা তখন ভারতের ঘরে ঘরে প্রকীর্ত্তিত। মেঘনাদ দেবরাজ ইন্দ্রকে পর্য্যন্ত যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার অপর এক নাম ছিল, ইন্দ্রজিৎ।

মেঘনাদ এক্ষণে বিবাহোপযুক্ত যুবক। রাক্ষসরাজ পুত্র মেঘনাদের জন্য সম্প্রতি পাত্রীর সন্ধান করিতেছিলেন। উপযুক্ত রাজকুমারীর সন্ধানে রাবণ দেশে দেশে লোকও প্রেরণ করিয়াছেন।

একদিন স্বর্গ হইতে নারদ মুনি রাবণের রাজ-সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাক্ষসরাজ রাবণ নারদকেই পাত্রী সন্ধানের উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া কহিলেন,—"মুনিবর, আপনি ভাল সময়েই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। যুবরাজ মেঘনাদের জন্য আপনাকে একটী উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান করিতে হইবে।"

নারদ সস্মিত বদনে উত্তর করিলেন,—"মহারাজ, আমি পূর্ব্বেই একটী উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান পাইয়াছি এবং সে বিষয় নিবেদন করিবার জন্যই আজি এখানে উপস্থিত হইয়াছি। আপনি অভয় দান করিলে আমি সমস্ত বিষয়ই আপনার নিকট বিবৃত করিতে পারি।"

রাবণ কহিলেন,—"যে পাত্রীটীর বিষয় কহিতেছেন, তাহার সম্বন্ধে যাহা অবগত আছেন, আপনি নিঃসঙ্কোচে সমুদয় আমার নিকট বিবৃত করুন্।"

নারদ কহিলেন,—"মহারাজ, সুমাত্রাধীশ্বর দৈত্যরাজ কালনেমীর বিবাহোপযুক্তা এবং অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী এক কন্যা আছে। রাজন্, একদিন আমি আকাশপথে গমন করিতে করিতে দৈত্যরাজপুরী হইতে বালিকা কণ্ঠ-নিঃসৃত এক অপূর্ব্বমধুর সঙ্গীত-রব শ্রবণ করিয়া তাহাতে আকৃষ্ট হই। অনন্তর দৈত্যরাজের নিকটে উপস্থিত হইয়া অবগত হই যে,—সেই সুখ-শ্রুত সঙ্গীত তাঁহারই একমাত্র কন্যা প্রমীলার কণ্ঠ-নিঃসৃত।

আমি কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া দৈত্যরাজনন্দিনী প্রমীলাকে আমার সন্নিকটে আনাইয়া তাহার সেই সুধাকণ্ঠে আবার সেই সঙ্গীতটী শ্রবণ করি। মহারাজ, দৈত্যবালা প্রমীলা বস্তুতঃই রমণীকুলের শিরোমণি। প্রমীলার ন্যায় রূপলাবণ্যময়ী ও সর্ব্বগুণসম্পন্না তেজস্বিনী কন্যা পৃথিবীতে একান্ত দুর্ল্লভ। মহারাজ, দৈত্যবালা প্রমীলা সর্ব্বাংশেই যুবরাজ মেঘনাদের উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।”

রাবণ নারদ মুনির এবম্বিধ বাক্যে হৃষ্টচিত্ত হইয়া কহিলেন,—“ঠাকুর, প্রিয় পুত্র মেঘনাদের জন্য আমি নিজে দেখিয়া পাত্রী নির্ব্বাচন করিব বলিয়াই সংকল্প করিয়াছি। অতএব আমি কাল আপনাকে সঙ্গে করিয়া একবার সেই দৈত্যরাজ্যে গিয়া রাজকন্যাকে দেখিয়া আসিতে চাই।”

মহর্ষি পরদিন আবার আসিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া রাবণের রাজসভা হইতে তখন নিষ্ক্রান্ত

যথাসময়ে রাক্ষসরাজ নারদের সমভিব্যাহারে তাঁহার বিমান-বিচারী সেই সুবৃহৎ পুষ্পক রথে আরোহণপূর্ব্বক দৈত্যরাজ কালনেমীর রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রাজচক্রবর্ত্তী ও রাজাধিরাজ রাবণের এই আকস্মিক আগমনে দৈত্যরাজ কালনেমী একবারে চমৎকৃত হইলেন। তিনি লঙ্কেশ্বরের যথোপযুক্ত আদর-অভ্যর্থনা করিয়া অতি বিনীত ভাবে দৈত্য রাজ্যে তাঁহার এই শুভাগমনের কারণ জিজ্ঞাসু হইলেন।

রাবণ দৈত্যরাজকে সস্নেহ সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়া কহিলেন,—"রাজন্, আমি আমার পুত্র মেঘনাদের জন্য আপনার কন্যাপ্রার্থী হইয়া আজ আপনার রাজধানীতে সমুপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে অনতিবিলম্বে একবার আপনার কন্যাটীকে দেখাইয়া আমাকে পরিতুষ্ট করুন।"

কালনেমী রাক্ষসরাজের এবম্বিধ অভাবনীয় ও অপ্রত্যাশিত অনুগ্রহ-বাক্যে পরমাপ্যায়িত

হইয়া তদ্দণ্ডেই রাবণকে তাঁহার কন্যা আনিয়া দেখাইলেন।

রাক্ষসাধিপতি দৈত্যবালা প্রমীলার অসামান্য রূপ-লাবণ্য দেখিয়া তাঁহাকেই যুবরাজের উপযুক্ত পাত্রী বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেন এবং প্রীতি-প্রফুল্ল হৃদয়ে সেই দিনই মেঘনাদের সহিত প্রমীলার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া লঙ্কায় প্রত্যাগমন করিলেন।

শুভ বিবাহের শুভ দিন নির্দ্ধারিত হইল। লঙ্কায় ও সুমাত্রায় বিবাহোৎসবের এক বিরাট ঘটা পড়িয়া গেল। দুই বিশাল রাজ্য যুড়িয়া ঢেউ খেলাইয়া আনন্দের খর স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল।

কালে বিবাহের দিন সমুপস্থিত হইল। রাক্ষস রাজ অগণিত সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে রাজোচিত এক বিরাট শোভাযাত্রা সহ যুবরাজ মেঘনাদকে বর সাজে সজ্জিত করাইয়া কালনেমীর রাজ্যে আসিয়া উপনীত হইলেন।

শুভ মুহূর্ত্তে মেঘনাদের সহিত প্রমীলার বিবাহ সুসম্পন্ন হইল। চারি চক্ষুর মিলন হইল। উভয়েই উভয়ের রূপে মুগ্ধ হইলেন। মেঘের সহিত স্থির-বিদ্যুৎ মিশিয়া অপূর্ব্ব শোভার বিস্তার করিল।

দৈত্যরাজ কালনেমী ও রাণী রম্ভাবতী এইরূপ সোণার চাঁদ জামাতা পাইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। রাজারাণী চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে তাঁহাদের আদরিণী কন্যাকে জামাতার সহিত রাবণের সেই অপূর্ব্ব পুষ্পক রথে তুলিয়া দিলেন। বাসন্তীও রাজারাণীকে প্রণাম করিয়া প্রমীলার অনুবর্ত্তিনী হইলেন। নৃমুণ্ডমালিনী ও উগ্রচণ্ডা প্রভৃতি কতিপয় স্নেহশীলা পরিচারিকাও প্রমীলার সঙ্গে তাঁহার শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিল।

পুষ্পক রথ দেখিতে দেখিতে বায়ুবেগে স্বর্ণ-লঙ্কায় আসিয়া সমুপস্থিত হইল। রাণী মন্দোদরী পুত্র-পুত্রবধূকে বরণ করিয়া রাজ-প্রাসাদে লইয়া গেলেন। রাণী মন্দোদরী পুত্রবধূর অপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া মুগ্ধা হইলেন।

মেঘনাদ প্রমীলার ন্যায় পরম রূপবতী ও সর্ব্বগুণ-সম্পন্না পত্নী পাইয়া প্রাণে পরমানন্দ অনুভব করিলেন। প্রমীলাও আপনার আশানুরূপ সর্ব্বগুণ-বিভূষিত স্বামী-রত্ন লাভে, চিত্তে এক অনির্ব্বাচনীয় সুখানুভব করিলেন। লঙ্কার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই বধূ দেখিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

রাবণ নবদম্পতী পুত্র-পুত্রবধূকে কানন-বিহার যাপন জন্য মালয়-উপদ্বীপস্থ আপনার সুরম্য প্রমোদ-নিকেতনে প্রেরণ করিলেন। বাসন্তী প্রভৃতি সখীরাও প্রমীলার অনুগামিনী হইলেন।

নব দম্পতী সুশিক্ষিতা ও পরিহাস-রসিকা সখীগণ সহ প্রকৃতির লীলাকানন মালয়-দ্বীপের প্রমোদ-নিকেতনে মহাসুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন।



তৃতীয় পরিচ্ছেদ

লঙ্কার অবস্থা।



মেঘনাদ ও প্রমীলা প্রেমানন্দে কানন-বিহার যাপন করিতেছেন, ইত্যবসরে স্বর্ণলঙ্কায় এক মহা সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং সেই সমরাগ্নিতে সমগ্র লঙ্কা একবারে বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। যুবরাজ ইন্দ্রজিৎ ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিলেন না।

রাবণ জনক-নন্দিনী সীতাকে পঞ্চবটী বন হইতে রাম লক্ষ্মণের অনুপস্থিতিতে ইতঃপূর্ব্বেই অপহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। রাম লক্ষ্মণ সম্প্রতি সেই সীতার উদ্ধার কামনায় সুগ্রীব ও হনূমান্ প্রভৃতি বীর বানরগণের সাহায্যে ভারত-সমুদ্রের উপরে এক অপূর্ব্ব সেতু নির্ম্মাণ করিয়া লঙ্কায় আসিয়া উপনীত হইয়াছেন।

রাবণানুজ বিভীষণ রাবণকে রামের সীতা রামকে সসম্মানে প্রত্যর্পণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন, কিন্তু মদ-গর্ব্বিত লঙ্কেশ্বর তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না; অধিকন্তু বিভীষণকে পদাঘাত পূর্ব্বক স্বরাজ্য হইতে বিতাড়িত করিলেন।

বিভীষণ আসিয়া রামের শরণ লইলেন। রাম তাঁহাকে মিত্র জ্ঞানে পরম সমাদরে আশ্রয় দিলেন; বিভীষণ রামের অন্যতম সৈন্যাধ্যক্ষ পদে বরিত হইলেন।

রাক্ষস ও নর-বানরে এক ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। রাম লক্ষ্মণের ভীষণ অস্ত্রাঘাতে লঙ্কার বহু বীর মৃত্যু আলিঙ্গন করিল। রাবণের অপর ভ্রাতা মহাবীর কুম্ভকর্ণও যুদ্ধে গিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

রাবণ এই যুদ্ধে মহা ব্যতিব্যস্ত হইলেন। যুবরাজ মেঘনাদ প্রমোদ-উদ্যানে অবস্থান করিতেছেন। এই মহাযুদ্ধে এক্ষণে কাহাকেই বা প্রেরণ করেন? রাবণ অগত্যা তাঁহার অন্যতমা পত্নী

চিত্রাঙ্গদার গর্ভজাত পুত্র বীরবাহুকে যুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। বীরপুত্র বীরবাহু দুই তিন পর্য্যন্ত ভীষণ যুদ্ধ করিয়া রামের অস্ত্রাঘাতে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে রাবণের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। রাবণ ক্রোধে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া লঙ্কার অমঙ্গলরূপিণী সীতার শিরশ্ছেদ করিবার মানসে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে অশোক কাননের দিকে ধাবমান হইলেন। রাণী মন্দোদরী সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া গেলেন এবং রাবণের হস্ত ধরিয়া এই ভীষণ স্ত্রীহত্যা কার্য্য হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন।

রাক্ষসরাজ পুত্রশোকে কাতর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। কহিলেন,—"হায়! এই অনল-শিখারূপিণী জানকীকে আনিয়াই আমার স্বর্ণলঙ্কা আজ ছারখার হইতেছে। ভগিনী শূর্পণখা পঞ্চবটী বনে কি কুক্ষণেই এই ভুজঙ্গিণীরূপিণী সীতাকে দর্শন করিয়াছিল! বীরবাহুর ন্যায়

বীরপুত্র হারা হইয়া আজ আমি একেবারেই মহা শোক-সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছি।”

রাক্ষস-কুলপতি রাবণ এইরূপে বহুক্ষণ আক্ষেপ করিয়া অমাত্যবর্গকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—“চল যাই, সকলে বীরচূড়ামণি বীরবাহুর মৃত্যু-শয্যা দেখিয়া আসি।” এই বলিয়া রাক্ষসাধিপতি গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার সেই উচ্চ রাজ-প্রাসাদ-শিখরে আরোহণ করিলেন।

রাবণ দেখিলেন,—বীরপুত্র বীরবাহু অগণিত শত্রু সৈন্য দলন করিয়া রণক্ষেত্রে মৃত্যুশয্যায় শায়িত রহিয়াছে। বীরবাহুর এই মৃত্যুশয্যা দর্শন করিয়া দর-দর ধারায় রাবণের অশ্রুজল পড়িতে লাগিল।

শোকাবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে রাবণ মৃত পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—“বীর কুমার, যে শয্যায় আজি তুমি শয়ন করিয়াছ, ইহাই প্রকৃত বীরের শয্যা। সম্মুখ-সমরে শত্রু দলন করিয়া মৃত্যু আলিঙ্গন করা ত পরম গৌরবের বিষয়।

প্রাণাধিক, তুমি মরিয়াছ বটে,—কিন্তু তোমার এই মৃত্যুতে গৌরব আছে। এইরূপ বীরের ন্যায় মৃত্যু বীর জন মাত্রেরই চির-স্পৃহনীয়।”

রাবণ দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন,—নগরের বহির্ভাগে সমুদ্র তীরস্থ বালুকা রাশির ন্যায় অগণ্য শত্রু-সৈন্য নগর অবরোধ করিয়া অবস্থান করিতেছে। লঙ্কার চারিটী সিংহদ্বারই অবরুদ্ধ হইয়াছে। পূর্ব্ব দ্বারে নীল, দক্ষিণ দ্বারে অঙ্গদ, উত্তর দ্বারে সুগ্রীব এবং পশ্চিম দ্বারে স্বয়ং সীতানাথ শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও বিভীষণ, সমভিব্যাহারে সশস্ত্র দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সমুদ্রের দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—সমুদ্রের মধ্যে এক অপূর্ব্ব সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। ঠিক যেন সমুদ্রের মধ্য ভাগে এক প্রশস্ত রাজপথ!

এই অসম্ভব দৃশ্য দেখিয়া লঙ্কেশ্বর বিস্ময়ান্বিত হইলেন। যুদ্ধ জয়ের আশা তাঁহার নিকট দুরাশা বলিয়াই প্রতীয়মান হইল। রাক্ষসরাজ দুঃখিত অন্তঃকরণে রাজসভায় আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

অদূরে বামাকণ্ঠে করুণ আর্ত্তনাদ শ্রুতিগোচর হইল। পুত্রশোকাতুরা রাণী চিত্রাঙ্গদা আলুথালু বেশে সকরুণ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে রাজসভায় আসিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

অনেক যত্নে রাণীর চৈতন্যোদয় হইল। চিত্রাঙ্গদা পুত্রশোকে বিলাপ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসপতি রাণীকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন,—"দেবি, আর বৃথা বিলাপ করিও না। তোমার বীরপুত্র আজ বীরের মত শত্রু দলন করিয়া স্বর্গরাজ্যে প্রস্থান করিয়াছে। বীর পুত্রের জন্য বীর-মাতার বিলাপ অশোভনীয়। তোমার পুত্রের পরাক্রমে আজি রাক্ষসবংশের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে প্রিয়ে, অতএব তুমি আর খেদ করিও না। আমি নিজেও অত্যন্ত শোকক্লিষ্ট,—কিন্তু দেবি, আমার আর বিলাপের সময় নাই। পুত্রহন্তার তপ্ত রক্তে তরবারি রঞ্জিত করিয়া আজ পুত্রশোক বিস্মৃত হইব। যাও দেবি, অন্তঃপুরে যাও,—আমি পুত্র-হত্যার প্রতিশোধ লইতে চলিলাম।"

রাবণের গমন-পথ রোধ করিয়া পুত্রশোকাতুরা চিত্রাঙ্গদা উত্তর করিলেন,—"নাথ, দেশের শত্রু-দলনকারী বীর পুত্রের মাতা ভাগ্যবতী সন্দেহ নাই, কিন্তু নাথ, মাতার নিকট সন্তানের শোক অসহ্য। হায়! নাথ, শুধু তোমার নিজ কর্ম্ম-দোষেই তুমি আজ স্বর্ণলঙ্কা মজাইতে বসিয়াছ!"

সখীরা রাবণের আদেশে ত্বরিতে চিত্রাঙ্গদাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। চিত্রাঙ্গদা অন্তঃপুরে গমন করিলে রণোন্মত্ত রাবণ পুত্রশোকে আবার ভীষণ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। কহিলেন,—"এই কাল-সমরে এবার নিজেই গমন করিব। সকলে যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হও। আমার যুদ্ধের রথ সজ্জিত কর। আজি পৃথিবী হয় রামশূন্য, নয় ত রাবণশূন্য হইবে।"

অসীম বলদৃপ্ত রাবণের এই উত্তেজনা পূর্ণ উক্তি শ্রবণ করিয়া রাক্ষসবৃন্দ মাতিয়া উঠিল। রাজসভায় মেঘমন্দ্রে দুন্দুভির ধ্বনি হইতে লাগিল। লঙ্কার যাবতীয় বীর যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হইল।

সহস্র সহস্র হস্তী, লক্ষ লক্ষ অশ্ব এবং শত শত স্বর্ণচূড় রথ যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইল। কাতারে কাতারে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য বাহির হইতে লাগিল। রণ-বাদ্যের গম্ভীর ধ্বনি, অশ্বের হ্রেষারব, গজরাজির ভীষণ গর্জ্জন, অস্ত্রের ঝঞ্চনা অসংখ্য শঙ্খনাদ এবং সৈন্যবৃন্দের ভৈরব জয়-জয় রবে লোকের শ্রবণ-পথ যেন রুদ্ধ হইয়া গেল। বীরগণের বীরদর্পে লঙ্কা কাঁপিয়া উঠিল।

রাবণের এই যুদ্ধ-সজ্জার আয়োজন দেখিয়া স্বর্গে দেবতাদিগের মহা আতঙ্ক উপস্থিত হইল। রাবণের ভয়ে ত্রিভুবন কম্পান্বিত। দেবতারা রাবণের ভয়ে প্রতিনিয়ত অস্থির। দেবতাদিগের মধ্যে, প্রায় সকলেই রাবণের অত্যাচারে একান্ত জর্জ্জরিত।

রাবণ এই সময় যুদ্ধযাত্রা করিলে হয়ত রামের অমঙ্গল হইতে পারে,— এই ভাবনায় দেবতারা অস্থির হইয়া পড়িলেন। স্বর্গে দেবতাদিগের এক মন্ত্রণা-সভা বসিল।

দেবরাজ ইন্দ্র বলিলেন,—"যুবরাজ মেঘনাদ যুদ্ধে নিহত না হইলে রাবণকে বধ করা অসম্ভব। অতএব যাহাতে যুবরাজ এই সময় যুদ্ধ যাত্রা করে, তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। মেঘনাদ লঙ্কার এই শোচনীয় অবস্থার কথা কিছুই অবগত নহে। নবপরিণীত যুবরাজ মালয় উপদ্বীপের প্রমোদ-উদ্যানে পত্নীসহ অবস্থান করিতেছে। তাঁহাকে সংবাদ দিতে পারিলেই, সে পিতৃসাহায্যে আসিয়া উপস্থিত হইবে।"

দেবরাজের এই পরামর্শ সকল দেবতারই গ্রাহ্য হইল।

দেবরাজের আদেশে মায়াদেবী তখনই যুবরাজ মেঘনাদকে লঙ্কার সংবাদ দিবার উদ্দেশ্যে, যুবরাজের ধাত্রী-মাতা প্রভাষা রাক্ষসীর বেশ ধারণ করিয়া মালয়-দ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন।



চতুর্থ পরিচ্ছেদ।



যুদ্ধার্থ মেঘনাদের লঙ্কা গমন।

মালয় উপদ্বীপে রাবণের এক অপূর্ব্ব প্রমোদ-কানন। এই রম্য প্রমোদ-কাননে সম্প্রতি ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলা অবস্থান করিতেছেন।

প্রমোদ-কাননের মধ্যে এক সুরম্য রাজপুরী। শত শত স্বর্ণস্তম্ভ সমন্বিত সৌধ-মালায় অসংখ্য হীরক-চূড়া। চতুর্দ্দিকে নন্দন-কানন সদৃশ রম্য বনরাজি। বন-বৃক্ষের শাখায় শাখায় কোকিল, দয়েল ও শ্যামা প্রভৃতি কলকণ্ঠ পাখীকুল মধুর কণ্ঠে গান করিতেছে। পুষ্পবৃক্ষসমূহে রাশি রাশি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া শোভা পাইতেছে। ফুলে ফুলে অলি গুঞ্জরণ করিতেছে। স্থানে স্থানে নির্ঝরিণী কুলু কুলু নাদে প্রবাহিতা।

এই প্রমোদ-উদ্যানে অপর কোন পুরুষের প্রবেশ অধিকার নাই। শত শত বীর-বামা শাণিত অস্ত্র করে এই প্রমোদ-কাননের প্রহরায় নিযুক্তা।

বসন্তের অপরাহ্ণ। উদ্যান-বাটীকার একটী সুসজ্জিত কক্ষ আজ সুখ-সঙ্গীতে মুখরিত। প্রমীলা আজ স্বামীকে সঙ্গীত শুনাইতেছেন।

সখী বাসন্তী বীণা ধরিয়াছেন। মেঘনাদ রাশি রাশি ফুলের মালা গলায় পরিয়া বন-দেবতার মত সেই অপূর্ব্ব কুঞ্জ-বাটীকার মধ্যে স্বর্ণ-সিংহাসনে উপবিষ্ট। প্রমীলা, সমগ্র প্রমোদ-কানন মুখরিত করিয়া, গাইলেন,—

"আজি, মধুময় এ পবন, মধুময় এ গগন,
এ মরম মধুময়,—
উছসি' উঠে,
অমৃত-মধুর ধারা সকলি করেছে হারা,
কহিতে মরম-কথা,—
ভাষা না
টুটে।

মধুময় শত ধার　　　হয়ে যেন অনিবার
এমনি অমৃত মাঝে,
এমনি লুটে,
জনম জনম মোর　　　এ প্রাণ অমৃত-ভোর
অমৃত-চরণ-রাঙা—
কমল-পুটে।"

মেঘনাদ একাগ্রচিত্তে প্রমীলার সুধা-কণ্ঠ নিঃসৃত সঙ্গীতামৃত পান করিতে লাগিলেন।

এমন সময় সহসা সকলকে চমকিত করিয়া মায়াদেবী, মেঘনাদের ধাত্রীমাতা প্রভাষার বেশে সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন। সহসা উৎসব-স্রোতে বাধা পড়িল। সঙ্গীত বাদ্য বন্ধ হইয়া গেল।

যুবরাজ আসন হইতে উঠিয়া ধাত্রীমাতার চরণে প্রণাম করিলেন। প্রভাষারূপিণী মায়াও সস্নেহে যুবরাজের শিরশ্চুম্বন করিলেন।

যুবরাজ কহিলেন,—"মা, লঙ্কার কুশল ত? আজি এই সময় আপনার আগমনের কারণ কি?"

ছদ্মবেশিনী মায়া উত্তর করিলেন,— "বৎস, স্বর্ণ-লঙ্কার অবস্থার কথা কহিতে আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। রামের যুদ্ধে তোমার স্নেহের ভ্রাতা বীরবাহু প্রাণত্যাগ করিয়াছে। পুত্রশোকে লঙ্কেশ্বর অদ্য সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিতে-ছেন। ঐ শুন, ঐ— লঙ্কার ভীষণ সমর-গর্জ্জন শুনা যাইতেছে!"

মহাবীর ইন্দ্রজিৎ এই অসম্ভব বার্ত্তায় অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ধাত্রী-মা, রাম-লক্ষ্মণ কি এখনও জীবিত আছে? আমাদের সেনাপতিরা কি এখনও উহাদিগকে বিনাশ করিতে পারে নাই? সংবাদ পাইলে এতদিনে নিশ্চয়ই আমি উহাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিতাম।"

ধাত্রী-মা উত্তর করিলেন,—"বৎস, রামলক্ষ্মণের দারুণ অস্ত্রাঘাতে লঙ্কার বহু বীর নিপতিত হইয়া-ছেন। তোমার পিতৃব্য মহাবীর কুম্ভকর্ণও যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। সীতানাথ পরম মায়াবী। তুমি

অচিরে যুদ্ধ-যাত্রা করিয়া এক্ষণে রাক্ষসকুলের গৌরব রক্ষা কর। বৎস, রাক্ষসকুল ছারেখারে যাইতেছে, স্বর্ণলঙ্কা ধ্বংস প্রায়; এখন একমাত্র তুমিই আমাদের সকল ভরসা, বৎস, আর বিলম্ব করিও না।—”

এই বলিয়া প্রভাষা অদৃশ্য হইলেন।

মেঘনাদ ধাত্রী-মাতার বচন শ্রবণে গলার ফুল-মালা সরোষে ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া কহিলেন,—“আমাকে শত ধিক্, নর বানর শত্রুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া আমিই কনক-লঙ্কার সর্ব্বনাশ করিয়াছি। আমার জন্মভূমি স্বর্ণলঙ্কা আজ শত্রুগণ-পরিবেষ্টিত, আর আমি কি না এ স্থলে বামাদলবেষ্টিত হইয়া আমোদ-প্রমোদে রত! আমার পক্ষে এ কর্ম্ম বড়ই অশোভনীয়! দূতি, শীঘ্র আমার রথ সজ্জিত কর। মুহূর্ত্তে শত্রু নিপাত করিয়া আসিয়া আমি পুনরায় আমোদ-প্রমোদে নিযুক্ত হইব।”

এই বলিয়া ইন্দ্রজিৎ বীর-সাজে সজ্জিত হইয়া প্রিয়তমা পত্নী প্রমীলার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন।

প্রমীলা পতির করযুগল ধারণ করিয়া কহিলেন,—"প্রিয়তম, তোমা ছাড়া হইয়া আমি কিছুতেই এখানে থাকিতে পারিব না। আর এই অন্যায় সমরে তোমাকে প্রেরণ করিতেও আমার চিত্ত রাজি হইতেছে না। যদি একান্তই যুদ্ধে যাও, আমাকেও সঙ্গে লইয়া যাও।"

মেঘনাদ কহিলেন,—"প্রিয়ে, তুমি এই যুদ্ধকে অন্যায় সমর বলিতেছ কেন?"

প্রমীলা বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন,—"প্রিয়তম, আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—পরের স্ত্রীকে অপহরণ করিয়া আনা শ্বশুর মহাশয়ের পক্ষে নিতান্তই অশোভনীয় হইয়াছে। সতী লক্ষ্মী সীতার দীর্ঘ-নিঃশ্বাসে লঙ্কার যে পরম অমঙ্গল হইবে, তাহা আমি লঙ্কায় পদার্পণ করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। রাম সীতার ন্যায় পত্নীহারা হইয়া আজ কিরূপ বিপদসাগরে মগ্ন হইয়াছেন, তাহা তুমি সহজেই বুঝিতে পার। প্রিয়তম, এই যুদ্ধের ন্যায়-অন্যায় তুমিই আমা অপেক্ষা

ভাল বুঝিবে। আমি সামান্য অবলা মাত্র, তোমার ন্যায় গুণবানকে বুঝাইতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। কিন্তু, হৃদয়েশ্বর! এই যুদ্ধে তোমায় পাঠাইতে কিছুতেই আমার চিত্ত রাজি হইতেছে না।"

মেঘনাদ কহিলেন,—"প্রিয়ে! যাহা কহিলে সকলই সত্য। কিন্তু পিতার ন্যায়-অন্যায় পুত্রের বিচার্য্য নহে। আমি শুধু জানি,—

"পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ॥"

আমি পিতার বিপদে আজ পিতার সাহায্য করিব। সর্ব্ব প্রযত্নে পিতৃ-আদেশ প্রতিপালন করিব। আর আমি আমার জন্মভূমি স্বর্ণ-লঙ্কার স্বার্থ ও গৌরব রক্ষার জন্য বজ্রের শক্তিতে শত্রু দলন করিব।"

প্রমীলা কহিলেন,—"হৃদয়সর্ব্বস্ব! তোমায় উপদেশ দেওয়া আমার ধৃষ্টতা মাত্র। আমি তোমার দুইটী পায়ে ধরিয়া অনুরোধ করিতেছি,

হৃদয়েশ্বর! তুমি শ্বশুরঠাকুরকে বলিয়া কহিয়া রামের সীতা রামকে প্রত্যর্পণ করাও। তোমার ন্যায় উপযুক্ত পুত্রের কথা তিনি কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। নাথ, আমাকেও না হয় তোমার সঙ্গে লঙ্কায় লইয়া চল। আমি চক্ষের জলে মহারাজের চরণযুগল সিক্ত করিয়া আমার হৃদয়ের কাতর প্রার্থনা তাঁহার চরণে নিবেদন করিব। প্রাণাধিক, তোমাকে অধিক আর কি বলিব, নারীর লাঞ্ছনায় কাহারও মঙ্গল হয় না। স্বর্ণ-লঙ্কাকে বিনা যুদ্ধেই রক্ষা কর। যুদ্ধে অনর্থক আর লোকক্ষয় করিও না।”

মেঘনাদ প্রমীলার হাত ধরিয়া তাঁহাকে উঠাই-লেন। কহিলেন,—“প্রিয়ে, অনুরোধ উপরোধের এক্ষণে আর সময় নাই। আমি আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিতে পারিতেছি না। প্রমীলে, তুমি কিছুমাত্র উদ্বিগ্না হইও না। আমি রামলক্ষ্মণকে ও রক্ষঃকুলাঙ্গার বিভীষণকে প্রাণে কখনই বধ করিব না,—উহাদিগকে বন্দী করিয়া রাজ-পদে

আনিয়া উপস্থিত করিব মাত্র। মহারাজই উহাদের সমুচিত দণ্ড বিধান করিবেন। প্রিয়ে! তুমি বিন্দুমাত্রও উদ্বিগ্না হইও না। যুদ্ধ জয়ের পর-ক্ষণে আজই আমি পুষ্পকারোহণে আবার এখানে আসিয়া তোমার আনন্দ বর্দ্ধন করিব।"

প্রমীলা তখন তাঁহার উদ্বেগাকুল অশ্রু রোধ করিয়া কহিলেন,—"নাথ,—বেশ, যদি একান্তই যুদ্ধে যাও, তবে আমাকেও সঙ্গে লইয়া চল। আমিও আজ তোমার যুদ্ধ-সঙ্গিনী হইয়া তোমার সহধর্ম্মিণী নামের প্রকৃত সার্থকতা দেখাইব।"

পত্নীর এবম্বিধ বীরদর্প দেখিয়া মেঘনাদ বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন,—প্রমীলা কেবল বীরপত্নী নহে,—পরন্তু বীরাঙ্গনা।

প্রকাশ্যে কহিলেন,—"বীরাঙ্গনে,তুমি বিন্দুমাত্রও বিচলিতা হইও না। তুমি যে বীরচুড়ামণি ইন্দ্র-জিতের সম্পূর্ণ উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী, তাহা আমি বিশেষ রূপেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। ক্ষুদ্র নর আর বানরের যুদ্ধে আমি আজ তোমাকে সঙ্গিনী করিয়া

নিজের গৌরব ও তোমার গৌরব ক্ষুণ্ণ করিতে চাহি না। প্রিয়ে, এক্ষণে বিদায় দাও, আমি আজই শত্রু জয় করিয়া ফিরিয়া আসিব।"

প্রমীলা এক দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিলেন ; তাঁহার নয়নে মুক্তার মত দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল।

মেঘনাদ আপনার সেই বহুমূল্য কুসুম-সুকোমল উত্তরীয় অঞ্চলে প্রমীলার অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া তাঁহার সেই সুন্দর গোলাপী-গণ্ডে একটী চুম্বন-চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া বেগে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

বাহিরে রথ প্রস্তুত ছিল। মহাবীর লম্ফ দিয়া রথারোহণ করিলেন। রথ আকাশপথে মুহূর্ত্তমধ্যে লঙ্কায় উপনীত হইল।

রাবণ রণ-সজ্জায় সজ্জিত হইতেছেন, এমন সময় মেঘনাদ পিতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া পিতার চরণ বন্দনা করিলেন। পিতা পুত্রকে সস্নেহে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিলেন।

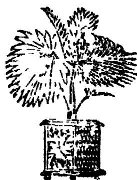
মেঘনাদ কহিলেন,—"পিতঃ! আমি লঙ্কার অবস্থার বিষয় সকলই অবগত হইয়াছি। আপনি যুদ্ধ সজ্জা ত্যাগ করুন। আমায় অনুমতি দিন, আমি সমূলে রামকে নির্ম্মূল করিয়া আসি।"

রাবণ কুমারের মস্তক চুম্বন করিয়া কহিলেন,— "বৎস, তুমিই এক্ষণে একমাত্র এই রাক্ষসকুলের ভরসা স্থল। তোমাকে এই যুদ্ধে প্রেরণ করিতে আমার সাহস হইতেছে না। আমি বুঝিয়াছি, বিধাতা আমার প্রতি বড়ই বিরূপ হইয়াছেন। নচেৎ ক্ষুদ্র নর-বানরের যুদ্ধে আজ আমার এমন সর্ব্বনাশ হইতেছে কেন?"

পুত্র বীরদর্পে উত্তর করিলেন,—"পিতঃ, আপনার এই পুত্র বর্ত্তমান থাকিতে আপনার যুদ্ধে যাওয়া কখনই সঙ্গত হয় না। আর সেই ক্ষুদ্র রামকে আপনি এত ভয়ই বা করিতেছেন কি জন্য? আপনি আজ্ঞা করিলে আমি এখনই রাক্ষসকুল-কলঙ্ক বিভীষণের সহিত রামলক্ষ্মণকে বন্দী করিয়া আপনার চরণ-সন্নিধানে উপস্থিত করিব।"

রাবণ কহিলেন,—"বৎস, ভ্রাতা কুম্ভকর্ণকে যুদ্ধে পাঠাইয়াছিলাম, ঐ দেখ, সাগরতীরে ভ্রাতৃ-বরের পর্ব্বতপ্রতিম মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। বৎস, তোমার ভ্রাতা বীরবাহুকেও যুদ্ধে পাঠাইয়া হারাইয়াছি। অতএব এই কাল-সমরে কোন্ প্রাণে তোমায় প্রেরণ করিব? তবে যদি একান্তই তোমার যুদ্ধ সাধ হইয়া থাকে, তবে বৎস, যথারীতি তোমার ইষ্টদেবতার পূজা সম্পূর্ণ কর। সূর্য্য অস্তমিত প্রায়। আজ তোমাকে সেনাপতি পদে বরণ করিতেছি, কাল যুদ্ধ যাত্রা করিও।"

এই বলিয়া লঙ্কেশ্বর যুবরাজ মেঘনাদকে পবিত্র গঙ্গোদকে অভিষেক করিয়া সেনাপতি পদে বরণ করিলেন। রাক্ষসগণের জয় জয় নাদে লঙ্কা আবার কাঁপিয়া উঠিল।



পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সীতা ও সরমা।



যুবরাজ ইন্দ্রজিৎ সেনাপতি পদে বৃত হইয়াছেন। রাক্ষসগণের ঘরে ঘরে আজি আনন্দোৎসবের কলকল হলহলা।

রাত্রিতে লঙ্কার স্বর্ণ-সৌধ সমূহ লক্ষ লক্ষ প্রদীপ মালায় পরিশোভিত হইয়া এক অপরূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। রাক্ষসগণের সঙ্গীত-বাদ্যে সমগ্র লঙ্কা মুখরিত হইতেছে। স্বর্ণচূড় উচ্চ সৌধাগ্রে শত সহস্র ধ্বজপতাকা নৈশ সমীরণে পত পত শব্দে উড়িতেছে। লঙ্কার প্রশস্ত রাজপথে বর্ষাকালের বিশাল জল-স্রোতের ন্যায় বিরাট জন-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে।

সকলেই আজি মহোৎসবে মাতোয়ারা। আজি-কার নিশায় নিদ্রাদেবী লঙ্কা ছাড়িয়া পলায়ন

করিয়াছেন। রাক্ষসগণের মুখে আজ কেবল এক কথা,—"কাল যুবরাজের যুদ্ধে রামলক্ষ্মণের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।"

অশোক-কাননে পতি-বিরহিনী সীতা একাকিনী এক অন্ধকার পূর্ণ কুটীরে বসিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। দুরন্ত রাক্ষসী চেড়ীরা সীতাকে আজ একাকিনী রাখিয়া নিজ নিজ গৃহে গিয়া উৎসব-কৌতুকে মত্ত হইয়াছে।

সীতার অপূর্ব্বরূপে সমগ্র কানন যেন আলোকিত হইয়াছে। অন্ধকারময় খনি-গর্ভে যেন সূর্য্যকান্তমণি শোভা পাইতেছে।

সীতা ভাবিয়া ভাবিয়া বড়ই ব্যাকুলা হইতেছেন। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ কালি যুদ্ধে যাইতেছেন,—কি হয় কে জানে? আবার ভাবিতেছেন,—আমার স্বামী বিশ্বজয়ী,—যিনি হর-ধনু ভঙ্গ করিয়াছেন, যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় অসম্ভব। কিন্তু যদি যুবরাজ ইন্দ্রজিৎ এই ভীষণ যুদ্ধে প্রাণ-ত্যাগ করেন, তবে নিরপরাধা সতী প্রমীলার কি উপায় হইবে?

নানা কথা চিন্তা করিয়া সীতার কুসুম-কোমল প্রাণটা যেন পুড়িয়া পুড়িয়া ভস্ম হইতেছে। এমন সময় বিভীষণ-পত্নী সরমা সুন্দরী আসিয়া সীতার পদ-প্রান্তে উপবেশন করিলেন।

সরমা আপনার বস্ত্রাঞ্চলে সীতার নয়নাশ্রু মার্জ্জনা করিয়া কহিলেন,—"দেবি, চেড়ীরা আজ তোমাকে একাকিনী রাখিয়া গিয়াছে জানিয়া, আমি তোমার দুঃখ-কাহিনী শুনিবার জন্য আসি-লাম। তোমার কথা শুনিতে আমার বড়ই ভাল লাগে। যদি তোমার আপত্তি না থাকে, আমাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বল সই।"

এই বলিয়া সরমা বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটী বহুমূল্য সুরঞ্জিত সিন্দুরের কৌটা বাহির করিয়া সীতার সীমন্তে একটী ফোঁটা দিলেন। নিরাভরণা সীতার সুন্দর ললাটে সেই সিন্দুর বিন্দু যেন গোধূলি-ললাটে তারা-রত্নের মত প্রতিভাত হইল। সরমা সিন্দুরের কৌটা দিয়া সীতার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। সীতাও প্রতিদানে সরমার সীমন্তে

একটী সুন্দর সিন্দুরের কৌটা অঙ্কিত করিয়া দিলেন।

সরমা কহিলেন,—"দেবি, সুধাকণ্ঠে তোমার অপূর্ব্ব স্ব[illegible] তোমাদের বনগমনের কথা [illegible] কিন্তু কেমন করিয়া রঘুকুলমণি বীর রামচন্দ্র মহাবাহু লক্ষ্মণের নিকট হইতে তোমাকে রাক্ষসেন্দ্র অপহরণ করিয়া আনিলেন এবং কেমন করিয়াই বা তুমি এইরূপ নিরাভরণা হইলে, তাহা শুনিতে আমার বড়ই কৌতূহল হইতেছে। সই, যদি মনে ব্যথা না পাও তবে আমায় আজ সকল কথাই খুলিয়া বল।"

সরমার এইরূপ আগ্রহাতিশয্যে মধুরভাষিণী সীতা সরমাকে সস্নেহে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন,—"সখি, এই রাক্ষসপুরে তুমিই আমার একমাত্র হিতৈষিণী। আমার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত শুনিতে তোমার যদি এতই বাসনা হইয়া থাকে; তবে শুন;—

"আমরা পঞ্চবটী বনে গোদাবরী নদীর তটে এক সুন্দর পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতাম।

দেবর লক্ষ্মণ সর্ব্বপ্রযত্নে আমাদিগের সেবা করিতেন। লক্ষ্মণের গুণে আমাদিগের কিছুরই অভাব হইত না। রাজকন্যা ও রাজপুত্রবধূ হইলেও বনবাসে আমি কিছু মাত্র ক্লেশ বোধ করি নাই।

আমাদের কুটীরের চারিদিকে নিত্য নিত্য কত যে ফুল ফুটিত তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমি কখনও ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিতাম, আর কখনও বা সেই ফুলের মালা গলায় পরিয়া আত্মসুখে বিভোর রহিতাম। প্রাণেশ্বর সময় সময় আমায় বনদেবী বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া কতই না সোহাগ করিতেন।

সই, প্রভাতে পিকরাজের সুধা-স্বর-লহরীতে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইত। ময়ূর ময়ূরী পাখা বিস্তার করিয়া আমার দ্বারে আসিয়া নৃত্য করিত। নানা রং-এর মৃগশিশু ও নানা জাতীয় বিহঙ্গম খাদ্যলাভের জন্য আমার কুটীরে আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিত। আমি সকলকেই পরমাদরে সেবা-যত্ন করিতাম। কখনও বা সতী-সাধ্বী ঋষীপত্নীগণ

এই দাসীর কুটীরে পদার্পণ করিতেন। আমি মৃগ চর্ম্ম পাতিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে বসাইতাম। তাঁহারা আমায় কত আদর যত্ন করিতেন।

আমি কখনও কুরঙ্গিণীদিগের সঙ্গে বনে বনে বিচরণ করিতাম, কখনও কোকিলার কণ্ঠানুকরণে গীত গাইতাম। কখনও বা নবলতিকার সঙ্গে নব তরুর বিবাহ দিতাম,—দম্পতি মুকুল-মঞ্জরিত হইলে মুকুলগুলিকে নাতিনী বলিয়া সম্ভাষণ করিতাম। মুকুলগুলি যখন প্রস্ফুটিত হইত, তখন অলি আসিয়া তাহাতে গুঞ্জরণ করিত। আমি অলিরাজকে নাতিনী-জামাই বলিয়া সাদরে বরণ করিতাম।

কখনও জ্যোৎস্না-বিধৌত সুচারু যামিনীতে প্রাণেশ্বরের সঙ্গে নদী তটে বিচরণ করিতাম। কখনও প্রাণনাথের চরণ তলে বসিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব বচন-সুধা পান করিতাম। হায় সখি, আমি কবে আবার আমার প্রাণনাথের সেই চরণ-তলে যাইয়া উপবিষ্ট হইব, আমি কবে আবার

তাঁহার সেই প্রীতি-প্রফুল্ল মুখচ্ছবি দেখিয়া আনন্দ-নীরে ভাসিব ?”

এই বলিয়া সীতা আবার ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সরমা কহিলেন,—“দেবি, পূর্ব্বের সেই সুখ-স্মৃতিতে তোমার মনে ব্যথা জাগিতেছে ; অতএব সে প্রসঙ্গে আর প্রয়োজন নাই। তোমার চক্ষুর জল দেখিলে যে আমার মরিতে ইচ্ছা হয় সই !”

সীতা উত্তর করিলেন,—“সই, এই রাক্ষসপুরে তুমিই আমার দুঃখের একমাত্র অংশী। অতএব তোমাকে আমার সেই সুখ-দুঃখের কাহিনী না শুনাইলে, আর কাহাকে শুনাইব ? সখি, জন্ম-দুঃখিনী সীতার কাহিনী মনোযোগ দিয়া শুনিয়া যাও। তোমার কাছে আমার দুঃখ-কাহিনী বিবৃত করিলে আমার দুঃখ হয়ত কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত হইবে।”

সরমা কহিলেন,—“দেবি, তোমার কথা শুনিয়া আমার রাজভোগ ত্যাগ করিয়া বনগমনে অভিলাষ

হইতেছে। সই, লঙ্কেশ্বর তোমাকে কি প্রকারে হরণ করিয়া আনিলেন, সে কথা শুনিবার জন্য আমার অন্তর বড়ই ব্যাকুল হইতেছে।”

জানকী কহিলেন,—“সখি, এইরূপে পঞ্চবটী বনে আমাদিগের মহাসুখে দিন কাটিতে লাগিল। সহসা একদিন তোমার ননদিনী শূর্পণখা আসিয়া আমাদের সকল সুখেই গরল মাখিয়া দিল!

নারীকুল-গ্লানি দুষ্টা শূর্পনখা আমাকে মারিয়া রামচন্দ্রকে বরণ করিতে চাহিল। প্রাণেশ্বর দুষ্টাকে প্রত্যাখ্যান করিলে রাক্ষসী আমার দেবর শ্রীমান্ লক্ষ্মণের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইল। সুমতি লক্ষ্মণও দুষ্টাকে প্রত্যাখ্যাতা করিলে রাক্ষসী আপনার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া লক্ষ্মণকে গিলিতে অগ্রসর হইল। লক্ষ্মণ পিশাচিনীর নাক-কাণ কাটিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন। সই; সেই দিন হইতেই অভাগিনী সীতার কপাল পুড়িল!

ভগিনী শূর্পণখার এবম্বিধ অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য মায়াবী রাক্ষসরাজ মায়াজাল বিস্তার

করিল। কুক্ষণে আমি স্বর্ণ-মৃগরূপী মায়াবী মারীচের ছলনায় মুগ্ধ হইলাম !

প্রাণ-সখি; একদিন কুটীর দ্বারে একটী আশ্চর্য্য সুবর্ণ মৃগ দেখিয়া প্রাণেশ্বরকে কহিলাম,—নাথ, এই মৃগটী আমায় ধরিয়া দাও। প্রাণনাথ ধনুর্ব্বাণ হস্তে বাহির হইলেন লক্ষ্মণকে কুটীর রক্ষা করিতে বলিয়া গেলেন। সহসা অদূরে যেন নাথের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলাম। শুনিলাম, নাথ যেন বলিতেছেন,—"ভাই লক্ষ্মণ, এ বিপদের সময়ে তুমি কোথায়, আমি মরিলাম !" এইরূপ আর্ত্তনাদ শুনিয়া আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। দেবর লক্ষ্মণকে রামের সাহায্যে অগ্রসর হইতে বলিলাম।

দেবর উত্তর করিলেন,—"দেবি, আপনাকে এই বিজন কুটীরে একাকিনী রাখিয়া আমি কোথাও যাইতে পারিব না। মহাবীর রামচন্দ্রের কোন বিপদপাত অসম্ভব।"

আমি আবার আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলাম। তখন বুঝি নাই যে এই আর্ত্তনাদ মায়াবী মারীচেরই ছলনা মাত্র। এবার ধৈর্য্যহারা হইলাম। দেবর লক্ষ্মণকে কত কুবাক্য কহিলাম। বলিলাম,—"রে নির্ম্মম,তুই তবে কুটীর রক্ষাই কর,—আমি নিজেই শ্রীরামের সাহায্যে অগ্রসর হইব।"

দেবর লক্ষ্মণ আমার কটু বাক্যে লজ্জিত হইয়া কহিলেন,—"দেবি, আপনি আমার মাতৃতুল্যা, আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া চলিলাম। কিন্তু স্মরণ রাখিবেন, আমি নির্দ্দোষ।"

এই বলিয়া সুমতি লক্ষ্মণ দ্রুতবেগে বনগমন করিলেন। সই, প্রাণেশ্বরের বিপদাশঙ্কায় আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। নানা কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম। সহসা গৃহদ্বারে দণ্ড কমণ্ডলু করে এক সন্ন্যাসীকে দণ্ডায়মান্ দেখিলাম। সন্ন্যাসী ভিক্ষা যাচ্ঞা করিল। সন্ন্যাসীকে কুটীর হইতেই ভক্তিভরে প্রণাম করিলাম। হায় সখি, আমি কি জানিতাম যে,—সেই সন্ন্যাসীই এই পুষ্পরূপী

কালসর্প ? সই, যদি জানিতে পারিতাম, আজ তবে আমার এ দশা হইত না ! আর এই অভাগিনীর জন্য তোমাদিগের এই স্বর্ণলঙ্কাও ছারেখারে যাইত না। সই, এই হতভাগিনীর দোষে লঙ্কার কত রমণী যে অনাথা হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই !

স্বজনি, অতিথিকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলাম,—"প্রভু, আপনি কিছুকাল তরুমূলে বিশ্রাম করুন। আমার স্বামী ও দেবর এখনই ফিরিয়া আসিয়া আপনার যথোচিৎ অভ্যর্থনা করিবেন।"

সন্ন্যাসী কহিল,—"আমি ক্ষুধার্ত্ত অতিথি, হয় এখনই ভিক্ষা দেও, নচেৎ বল,—চলিয়া যাই।" সখি, আমি বড়ই বিপদে পড়িলাম। অতিথি বিমুখ করিলে প্রাণেশ্বর অসন্তুষ্ট হইবেন, এই ভয়ে লজ্জা ত্যাগ করিয়া ভিক্ষা হস্তে বাহির হইলাম। বাহির হইবা মাত্রই সন্ন্যাসি-বেশী দুষ্ট লঙ্কাপতি শার্দ্দূলের মত আমায় ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহার রথে তুলিল। আমি কত হাহাকার ও আর্ত্তনাদ করিলাম। কিন্তু দুষ্টের কঠিন প্রাণ



রাবণ ও জটায়ু।

Asutosh Press, Dacca.

তাহাতে গলিল না। পথের চিহ্ন হেতু আমি আমার শরীরের অলঙ্কারগুলি পথে পথে ছুড়িয়া ফেলিতে লাগিলাম। সই, সেই জন্যই আজি আমি এইরূপ নিরাভরণা।

অতঃপর আমি দুরাত্মার রথে অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে চেতনা পাইলে দেখিলাম আমি ভূপতিতা। জটায়ু নামে এক বৃহদাকার পক্ষী আমার রক্ষার্থে রাক্ষসরাজের সঙ্গে তুমুল সংগ্রামে নিরত। পক্ষীবর জটায়ু চঞ্চুর আঘাতে ও ভীষণ পাখসাটে পাপাত্মা লঙ্কেশ্বরের দেহ ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল। লঙ্কাপতি অবশেষে শাণিত অস্ত্রাঘাতে বীর পক্ষী জটায়ুর ডানা দুইটী একে একে কাটিয়া ফেলিল।

পক্ষিরাজ কাতর আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। সই, একটী বনের পাখী পর্য্যন্ত পরের জন্য এইরূপে আত্মোৎসর্গ করিল।

অতঃপর রাক্ষসরাজ পুনরায় আমাকে রথে উঠাইয়া লঙ্কারপানে রথ চালিত করিল। সখি,

তারপর যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সকলই তুমি বিদিত আছ। আমি কবে আবার যে প্রাণেশ্বরের মুখ-চন্দ্র দেখিব, তাহা বিধাতাই বলিতে পারেন!"

সরমা কহিলেন,—"দেবি, বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডাইতে পারে? তোমাকে হরণ করিয়া লঙ্কা-পতি সবংশে ধ্বংস হইবেন, ইহাই বোধ হয় বিধা-তার অভিপ্রায়। সই, তুমি বৃথা আর শোক করিও না। লঙ্কার গৌরব-রবি অস্তমিত প্রায়। ঐ শুন, একদিকে উৎসবের জয়-নাদ, আর এক দিকে শত শত বিধবা কুলবধূর করুণ ক্রন্দন ধ্বনি। আজি যুবরাজ যুদ্ধার্থে লঙ্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া-ছেন এবং লঙ্কেশ্বর তাহাকে সেনাপতি পদে বরণ করিয়াছেন। কালি তিনি যুদ্ধযাত্রা করিবেন। সখি, যুবরাজ যদি এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন তবে স্থির জানিও, লঙ্কার আর কোনই আশা নাই।"

সীতা কহিলেন, "সই সরমা, অমঙ্গলরূপিণী এই অভাগিনার দোষেই আজ তোমাদের স্বর্ণ-লঙ্কার এই শোচনীয় দশা। অবলা কুলবালাগণের

এই করুণ আর্ত্তনাদে দিবারাত্রি আমার প্রাণ ব্যথিত। সই, কাল আবার তোমাদের রক্ষকুলবধূ সতীসাধ্বী সদ্যযৌবনা প্রমীলার অদৃষ্টেই বা কি আছে, কে জানে? স্বজনি, এই হতভাগিনীর যদি মৃত্যু হইত, তবে হয়ত আজ এতগুলি রাক্ষস বধূকে অকালে এই দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না। সখি, লঙ্কেশ্বর সে দিন আমায় কাটিতে আসিয়াছিল, কাটিয়া ফেলিলে আজ আমার সকল জ্বালারই অবসান হইত! যদি এখন একবার প্রাণনাথের চরণ দর্শন পাইতাম, সই, তবে আজ লঙ্কার এতগুলি প্রাণের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহার চরণে অম্লান বদনে আমার এই একটা প্রাণ উৎসর্গ করিতাম। সই, বল দেখি, আমার সে মৃত্যু কতই না সুখের হইত!"

সরলা কহিলেন,—"ছিঃ সই, অমন কথা মুখে আনিও না। বিধাতা যাহার অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন তাহা তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে।"

সীতা-সরমার এবম্বিধ কথোপকথনে রাত্রির একার্দ্ধ অতীত হইল। অদূরে দুরন্ত চেড়ীগণের বিকট নিনাদ ও পদধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল।

সরমা সীতার পদে নমস্কার করিয়া কহিলেন,—"সই, তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে ত প্রাণ চাহে না। কিন্তু অদূরে চেড়ীবৃন্দের পদধ্বনি শুনিতে পাইতেছি। রাত্রিরও অর্দ্ধাংশ অতীতপ্রায়। যদি লঙ্কেশ্বর কোনওরূপে শুনিতে পান,—আমি তোমার কাছে আসিয়াছি, তবে আর রক্ষা নাই। অবকাশ মত আবার আসিয়া তোমার সুমধুর বচন-সুধা পান করিব; আজ আসি সই।"

এই বলিয়া সরমা প্রস্থান করিলেন। চেড়ীর দল বিকট রব করিতে করিতে সীতার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে নানাবিধ ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল।



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শ্রীরামচন্দ্রের শিবির।

লঙ্কার বহির্ভাগে সমুদ্র তীরে বহুস্থান যুড়িয়া শ্রীরামচন্দ্রের অসংখ্য শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছে। ঐ সকল শিবিরে লক্ষ্মণ, বিভীষণ, অঙ্গদ ও হনুমান প্রভৃতি বীরগণের অধিনায়কত্বে অগণিত বানর সৈন্য। রামচন্দ্র সীতার উদ্ধার কামনায় সমুদ্রের উপর এক অপূর্ব্ব সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া লঙ্কায় উপনীত হইয়াছিলেন। সমুদ্রের সেই বিশাল সেতু বাহিয়া বহু বানর সৈন্য অক্লেশে সেই দুস্তর সমুদ্র পার হইয়া আসিতেছে।

এদিকে রাক্ষসপতি রাবণ যুবরাজ ইন্দ্রজিৎকে সেনাপতি পদে বরণ করিয়া তাঁহার সেই যুদ্ধ-সজ্জা পরিত্যাগ করিলেন। অতঃপর শুক ও সারণ

নামক অমাত্যদ্বয়কে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—"রামের সৈন্য-সংখ্যার পরিমাণ করা কর্ত্তব্য মনে করিতেছি, কেন না যুবরাজ কালি যুদ্ধ যাত্রা করিবেন। অতএব তোমরা অতর্কিতভাবে বানর সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের সংখ্যা ও ভুজ-বীর্য্যের পরিচয় লইয়া আইস। রামের বল-বীর্য্য, অধ্যবসায় ও অস্ত্র পরিচয়, লক্ষ্মণের সাহস বিক্রম এবং বানরগণের সেনাপতিই বা কে কে, এই সমুদয় বিশেষরূপে অবগত হইয়া তোমরা শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে।"

মন্ত্রী শুক-সারণ রাক্ষসরাজের অনুমতিক্রমে বানররূপ ধারণ করিয়া বলবান্ বানর সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহারা দুইজনেই সেই বিরাট সৈন্যসমুদ্র দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তাহারা কিছুতেই সেই অগণিত বানরগণের সংখ্যা নির্ণয়ে সমর্থ হইল না।

শুক-সারণ রামের সৈন্য সমূহ দর্শন করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, এমন সময়ে সূক্ষ্মবুদ্ধি

বিভীষণ উহাদিগকে দেখিতে পাইয়া চিনিলেন এবং সেই ছদ্মবেশী দূতদ্বয়কে ধরিয়া লইয়া গিয়া রামের নিকটে উহাদের প্রকৃত পরিচয় দান করিলেন।

রাক্ষসদ্বয় রামচন্দ্রকে দেখিবামাত্র অতিশয় ভীত হইল এবং আপনাদিগের প্রাণের আশায় একেবারেই জলাঞ্জলি দিল।

রামচন্দ্র এই গুপ্ত চরদ্বয়ের আগমনের কারণ অবগত হইয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন,—"দেখ, আমরা যুদ্ধার্থ সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি, তোমরা আমাদিগের সৈন্য সমাবেশ দর্শন করিতে আসিয়াছ, যদি সে কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বচ্ছন্দে এক্ষণে প্রত্যাগমন কর। আর যদি তোমাদের সম্যক দর্শন না হইয়া থাকে, সখা বিভীষণ যাহা যাহা অবশিষ্ট আছে, সমস্তই তোমাদিগকে দেখাইবেন। তোমাদিগকে ধরিয়া আনা হইয়াছে বলিয়া তোমরা প্রাণের ভয় করিও না।"

অতঃপর মিত্র বিভীষণকে সম্বোধন করিয়া রামচন্দ্র কহিলেন;—"সখা, যদিও উহারা ছদ্মবেশে

আমার সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তথাপি দূত বলিয়া উহাদের উপর কোনরূপ অত্যাচার করিতে নাই। বরং উহারা নির্ব্বিঘ্নে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়া আমার এই কথা উহাদের রাজাকে বলুক যে, সে যে শক্তির সাহায্যে সীতা হরণ করিয়া আনিয়াছে, এক্ষণে বন্ধু-বান্ধব ও অন্যান্য সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে যতদূর সাধ্য, সেই শক্তি প্রদর্শন করুক। রামচন্দ্র যুদ্ধার্থে চিরপ্রস্তুত হইয়া রহিয়াছেন।”

শুক-স্নারণ রামচন্দ্রের এবম্বিধ উক্তি শ্রবণ করিয়া রামের জয়োচ্চারণপূর্ব্বক লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিল এবং লঙ্কেশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল,—“মহারাজ, আমাদিগকে দেখিবা মাত্র বধ করিবার জন্য আপনার ভ্রাতা বিভীষণ আমাদিগকে ধরিয়া শ্রীরামচন্দ্রের নিকট লইয়া গেলেন ; কিন্তু দয়ানিধি রামচন্দ্র দয়াপরবশ হইয়া আমাদিগকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। আমরা দেখিলাম,—মহাপরাক্রমশালী চারিজন বীর একত্র

এক স্থানে অবস্থিত। ইঁহারা,—রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও সুগ্রীব। রাজন্! অন্য বানরগণের আর প্রয়োজন কি, এই চারি বীর ইচ্ছা করিলেই এই বিশাল লঙ্কাপুরীকে সমূলে উৎপাটন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে পারেন। মহারাজ, তাঁহারা যুদ্ধার্থে প্রতিনিয়তই প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছেন। আমাদের প্রার্থনা, অকারণ আর বিরোধ না ঘটাইয়া রামের সীতা এখন রামকে প্রত্যর্পণ করুন।”

শুক-সারণের মুখে অকাতরে এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া রাবণ তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন,—“অপরের আর কথা কি, যদি দেব, দানব বা গন্ধর্ব্বও আমার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়, তথাপি লোকভয়ে সীতাকে প্রত্যর্পণ করিতে পারিব না। বানরগণ তোমাদিগকে হয়ত অত্যন্ত উৎপীড়ন করিয়াছে, সেই জন্যই তোমরা শঙ্কিত হইয়াছ এবং সীতাকে সমর্পণ করা সঙ্গত মনে করিতেছ।”

রাবণ অতঃপর এই মন্ত্রীদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া দূর হইতে রামের সৈন্য দর্শনার্থ তাঁহার সুবর্ণ-

প্রাসাদ-শিখরে আরোহণ করিলেন। মন্ত্রীদ্বয় তখন যাহা যাহা দর্শন করিয়া আসিয়াছে, অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তৎসমুদয় রাবণকে দেখাইতে লাগিল। রাবণ দূতগণের মুখে বানরদিগের সেই ভুজবীর্য্যের পরিচয় পাইয়া, তাহাদিগের আকৃতি দেখিয়া এবং রামের দক্ষিণ বাহুস্বরূপ মহাবলশালী লক্ষ্মণকে চিনিতে পারিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন।

রাবণ দেখিলেন,—রামের নিকটে ভ্রাতা বিভীষণ ও ভীমপরাক্রম সুগ্রীব সমুপবিষ্ট আছেন। তাহা-দিগের নিকটে বালী-নন্দন মহাবীর অঙ্গদ, মহাবাহু হনূমান ও দুর্জ্জয় জাম্ববান। আর, পার্শ্বে সুষেণ, কুমুদ, নীল, নল, গয়, গবাক্ষ ও শরভ প্রভৃতি মহা বীরগণ যথাযথ ভাবে উপবিষ্ট রহিয়াছে। রাবণ উহাদিগকে দর্শন করিয়া মহা ক্রুদ্ধ এবং উদ্বিগ্ন হইলেন। প্রাসাদ-শিখর হইতে নামিয়া আসিয়া যুবরাজ ইন্দ্রজিৎকে কল্য প্রাতে যথাবিধি নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সমাপনান্তে যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন।

রামচন্দ্রের শিবিরে যুবরাজের সেনাপতি পদে অভিষেকের সংবাদ পৌঁছিল। ইন্দ্রজিতের নামে ত্রিভুবন কম্পান্বিত। সুতরাং আগামী কল্য ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধার্থে বহির্গত হইবেন জানিয়া রামচন্দ্র চিন্তাকুল হইলেন এবং সেনাপতিগণকে আহ্বান করিয়া যুদ্ধ বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র কল্য কাহাকে যুদ্ধার্থে প্রেরণ করিবেন তাহা ভাবিয়া আকুল হইতেছেন, এমন সময়ে লক্ষ্মণ উঠিয়া কহিলেন,—"দাদা, আপনার অনুমতি হইলে কাল আমিই যুদ্ধে গিয়া দুরন্ত ইন্দ্রজিৎকে যমালয়ে প্রেরণপূর্ব্বক সীতার উদ্ধার কার্য্য সহজসাধ্য করিয়া তুলিব।"

রামচন্দ্র কহিলেন,—"ভাই লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিৎ পরম মায়াবী, সে যুদ্ধে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকেও বিচেতন করিতে পারে। সে তাহার অপূর্ব্ব রথা-রোহণে আকাশপথে থাকিয়া যখন যুদ্ধ করে, তখন তাহাকে পরাজিত করা দূরের কথা, তাহার দর্শন পাওয়াও ভার হইয়া উঠে। অতএব এই

মহা মায়াবী দুরন্ত নিশাচরের যুদ্ধে তোমায় কেমন করিয়া প্রেরণ করিব ভাই ?”

বিভীষণ কহিলেন,—“মিত্রবর! রাবণকুমার মেঘনাদ মহাযোদ্ধা সন্দেহ নাই। কিন্তু সে কেবল ব্রহ্মার বরেই এইরূপ মহা পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছে। ইন্দ্রজিৎ যে ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করিয়াছে, সেই ব্রহ্মাস্ত্র বলেই সে সকল যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহার নিধনের একটী সঙ্কেত আছে, আমি এক্ষণে আপনার নিকট তাহাই বিবৃত করিতেছি। ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মার অর্চ্চনা শেষ না করিয়া কখন যুদ্ধে বাহির হয় না। যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে যুবরাজ তাহার নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবিষ্ট হইয়া যথাবিধি ব্রহ্মার পূজা সমাপণপূর্ব্বক পরে যুদ্ধযাত্রা করে। কিন্তু যদি সে ব্রহ্মার পূজা সমাপণ না করিয়া উত্থিত হয়, তবে নিশ্চয়ই সে যুদ্ধে সে বিনষ্ট হইবে। আগামী কল্য প্রভাতে যুদ্ধ-যাত্রার পূর্ব্বে নিশ্চয়ই যুবরাজ নিকুম্ভিলায় প্রবিষ্ট হইয়া হোমকার্য্যে রত থাকিবে। সেই সময় আমরা

যজ্ঞাগারে প্রবিষ্ট হইয়া যদি তাহার যজ্ঞভঙ্গ করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করি, তবে নিশ্চয়ই তাহার বধ সাধনে সমর্থ হইব।"

রামচন্দ্র বিভীষণের এবম্বিধ বাক্যে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন,—"বৎস, তুমি হনূমান-প্রমুখ বীর বানরগণের সঙ্গে সমস্ত বানর-সৈন্য সমেত মায়াবী ইন্দ্রজিতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য প্রস্তুত হও। মিত্র বিভীষণ এই ভীষণ রাক্ষসের মায়াবল অবগত আছেন, অতএব ইনিও তোমার অনুগামী হইবেন।"

লক্ষ্মণ রামের এই বাক্যে মহা প্রীতিলাভ করিয়া ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।



সপ্তম পরিচ্ছেদ।



প্রমীলার লঙ্কা যাত্রা।



মালয় দ্বীপের প্রমোদ-উদ্যানে দৈত্যবালা প্রমীলা পতি-বিরহে বড়ই ব্যাকুলা হইয়া উঠিয়াছেন। ইন্দ্রজিতের গমনের পরক্ষণ হইতেই প্রমীলার নিকট এক একটা মুহূর্ত্ত যেন এক এক যুগ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। তাঁহার প্রাণটা যেন কেবলই ছট্‌ফট করিতেছে। এখন কিছুতেই যেন আর তাঁহার মন লাগিতেছে না। গৃহ হইতে বাহির হইয়া প্রথমে তিনি কিছুক্ষণ উদ্যানে বেড়াইলেন,—উদ্যান-শোভা তাহার আজ আর ভাল লাগিল না। গৃহে গিয়া একটা বীণা যন্ত্র লইয়া আসিয়া এক বৃক্ষমূলে একাকিনী বসিয়া একটা গান ধরিলেন,—গানের একটা পদ মাত্র উচ্চারণ করিয়াই আবার তাহা বন্ধ করিলেন। কিছুক্ষণ বীণা বাজাইলেন,



পতি বিরহে প্রমীলা

শিশু প্রেস

—বীণাও ভাল বাজিল না,—যাহা বাজিল, তাহাও যেন বেসুর। গৃহে আসিয়া একস্থানে বীণাটা ফেলিয়া রাখিলেন।

অতঃপর প্রমীলা তাঁহার সেই উচ্চ সৌধ-শিখরে আরোহণ পূর্ব্বক সতৃষ্ণ নয়নে স্বর্ণলঙ্কার দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কখনও বা মাথার উপরে গগন-পথে চাহিয়া রহিলেন,—কারণ,তাঁহার হৃদয়ারাধ্য হয়ত আকাশপথে সেই বিমান-বিচারী পুষ্পকে চড়িয়া আসিবেন। কিন্তু সতীর আশা পূর্ণ হইল না। ক্রমে সূর্য্যাস্ত হইল। প্রমীলা নিরাশার একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রুমালা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

বাসন্তী প্রমীলার মনের অবস্থা বুঝিলেন। সখীর অবস্থা দেখিয়া উদ্বিগ্না হইলেন। বাসন্তী প্রমীলাকে লইয়া নীচে নামিয়া আসিলেন। প্রমীলা সখীর গলা ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন,—"সই, রাত্রি সমাগত প্রায়, কিন্তু এখনও যে যুবরাজ কেন আসিতেছেন না, বুঝিতে পারিতেছি না।

এখনই আসিব বলিয়া চলিয়া গেলেন,কিন্তু তাঁহার এত বিলম্ব দেখিয়া আমি বড়ই ব্যাকুল হইতেছি। প্রাণনাথের এত বিলম্বের কারণ কি সই?”

বাসন্তী উত্তর করিলেন,—“এত ব্যাকুল হইও না,সখীমণি আমার, যুবরাজ যুদ্ধ জয় করিয়া এখনই আবার ফিরিয়া আসিবেন। তোমার ভয় কি সই? যুবরাজের সঙ্গে যুদ্ধে আঁটিয়া উঠিতে পারে, এই পৃথিবীতে এমন বীর কে? আজ বড় সুন্দর জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। চল সই,—আমরা ঐ কুঞ্জে যাইয়া দুই জনে বাছা বাছা ফুল তুলিয়া যুবরাজের জন্য সুচিক্কণ মালা গাঁথি। যুবরাজ আসিবা মাত্রই জয়মাল্যরূপে সেই মালা আমরা তাঁহার গলায় দোলাইয়া দিব।”

এই বলিয়া বাসন্তী প্রমীলাকে ধরিয়া লইয়া কুঞ্জ-কাননে প্রবেশ করিলেন। দুইজনে আঁচল ভরিয়া রাশি রাশি ফুল তুলিলেন। ফুল তুলিয়া দুই জনেই সযত্নে মালা গাঁথিলেন।

প্রমীলার মালা গাঁথা শেষ হইলে সখীকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন,—“সখি, এই ত আমার

মালা গাঁথাও শেষ হইল। কত যত্ন করিয়া এই মালা গাঁথিলাম, কিন্তু সই, এই মালা কাহার গলায়ই বা দোলাইব, আর এই অবশিষ্ট ফুলগুলি দ্বারাই বা কাহার চরণে অঞ্জলি দিব ? সই, আমি আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছি না। সই, চল্—আমরা লঙ্কায় যাই।”

বাসন্তী প্রমীলার এই অসম সাহসিকতায় চমৎকৃত হইলেন। মনে মনে প্রমীলার পতিপ্রাণতার প্রশংসা করিলেন। কহিলেন,—“সখি, এক্ষণে কি করিয়া তুমি লঙ্কায় প্রবেশ করিবে! রাঘবের অগণ্য বানর সৈন্য আজি লঙ্কার চতুর্দ্দিক অবরোধ করিয়া অবস্থান করিতেছে। এই রাত্রিকালে লঙ্কায় প্রবেশ করা কি সহজ কথা ? সই, আমাদের পক্ষে এক্ষণে লঙ্কায় প্রবেশ সম্পূর্ণই অসম্ভব।”

প্রমীলা বাসন্তীর কথায় কুপিতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। কহিলেন,—

“কি কহিলি বাসন্তী ? পর্ব্বতগৃহ ছাড়ি,
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে, ...

কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি ?
দানব-নন্দিনী আমি, রক্ষঃকুল বধূ ;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,—
আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে ?
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজ বলে
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি ?”

এই বলিয়া বীর-পত্নী ও বীরবালা প্রমীলা স্বয়ং রোষাবেশে অস্ত্রাগারে প্রবেশ করিলেন। অস্ত্রাগারে গিয়া তিনি শঙ্খনাদ করিলেন। প্রমীলার শঙ্খনাদ শ্রবণে শত শত নারী সৈন্য আসিয়া তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইল। প্রমীলা সকলকেই যুদ্ধার্থ সুসজ্জিতা হইবার জন্য আদেশ দান করিলেন। অমনই ঘন ঘন দুন্দুভির ধ্বনি হইতে লাগিল। সেই দুন্দুভির ভৈরব গর্জ্জনে দুর্গ হইতে বহু সংখ্যক বীরাঙ্গনা বহির্গত হইল। সকলেই বীরমদে মাতিয়া যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিতা হইতে লাগিল। বীরাঙ্গনাদিগের বীর নাদে সমগ্র দ্বীপ মুখরিত হইয়া উঠিল।

যে প্রমোদ কানন বীণা ও বেণুর বিনোদ ঝঙ্কারে নিয়ত মুখরিত থাকিত, মুহূর্ত্ত মধ্যে আজ তাহা বীরাঙ্গনাগণের বীর কোলাহলে পূর্ণ হইল। প্রমীলার সঙ্গিনী দৈত্যনন্দিনীরা বীরাভরণে সুসজ্জিতা হইয়া অশ্বারোহণ করিল। নৃমুণ্ডমালিনী এই সকল বীরাঙ্গনার অধিনায়িকা হইল। দানব-নন্দিনী প্রমীলাসুন্দরী দুর্গ প্রকোষ্ঠ হইতে এক অপূর্ব্ব বেশে সুসজ্জিতা হইয়া বহির্গত হইলেন। বীরাঙ্গনা বামাদল প্রমীলার জয়োচ্চারণ পূর্ব্বক সাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। সুকেশিনী প্রমীলার মস্তকোপরি উজ্জ্বল সুবর্ণ কিরীট পরিশোভিত হইল। কুসুম-সুকোমল পীনোন্নত বক্ষদেশ কঠিন কবচে সমাবৃত হইল। প্রমীলার বরবপু-বীরাভরণে সুশোভিত হইল।

পৃষ্ঠে তীরভরা তূণ, কটিতে শাণিত তরবারী এবং করে সুদীর্ঘ শূল ধারণ করিয়া বীরবালা প্রমীলা সুসজ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। প্রমীলার ইঙ্গিতে বাসন্তীও অশ্বারূঢ়া হইলেন। অতঃপর

প্রমীলা সঙ্গিনী দৈত্যবালাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"ভগিনিগণ! যুবরাজ যুদ্ধার্থ লঙ্কায় গিয়াছেন। যাওয়ার সময় বলিয়া গিয়াছিলেন,—আমি এখনই আবার ফিরিয়া আসিব। কিন্তু তাঁহার অত্যধিক বিলম্ব দেখিয়া আমার মন বড়ই আকুল হইতেছে। সেই জন্য আমি আজ এই নিশীথ সময়ে লঙ্কাগমনাভিলাষিণী হইয়াছি। শুনিলাম,—রাঘবের সৈন্য দ্বারা লঙ্কা অবরুদ্ধ। এক্ষণে আমাদিগকে রাঘবের সৈন্যদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া লঙ্কাপ্রবেশ করিতে হইবে। আমি সংকল্প করিয়াছি, যদি রামের সৈন্যগণ আমাদিগকে কোনরূপ বাধা দেয়, তবে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিব। আর যদি সহজে আমাদিগের পথ ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে আর অকারণে যুদ্ধ করিব না। কেন না, আমার শ্বশুর ও স্বামী উভয়েই মহাযোদ্ধা। কিন্তু যদি রাম আমাদের সহিত যুদ্ধে রত হন, তবে আমরা কেহই যেন পশ্চাৎপদ না হই। কেন না, আমরা দানব-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সম্মুখ সমরে শত্রু

নাশ করাই আমাদিগের কুলবিধি। অতএব আজ আমাদের অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, আমরা নিজ নিজ ভুজবলে লঙ্কাপ্রবেশ করিব।”

প্রমীলার এই উত্তেজনাপূর্ণ উক্তিতে সকলেই উৎসাহিতা হইয়া উঠিল। প্রমীলা সকলকেই অশ্ব চালনা করিতে আদেশ দান করিলেন।

দ্রুতগামী অশ্ব সমূহ বায়ুবেগে ছুটিয়া চলিল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহারা সমুদ্রতীরে আসিয়া পৌঁছিলেন। সমুদ্র বক্ষে জলযান প্রস্তুত ছিল। তাঁহারা সেই জলযান আরোহণ পূর্ব্বক অল্প কালের মধ্যেই অপর পারে অবতরণ করিলেন। আবার সকলেই অশ্বারোহণ করিলেন। ঠিক দুপ্রহর রাত্রিতে বীরাঙ্গনাগণ লঙ্কার পশ্চিম দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও বিভীষণের সহিত তখন শিবিরে বসিয়া যুদ্ধ সম্বন্ধে পরামর্শ করিতেছিলেন। আর হনূমান শিবির দ্বার রক্ষা করিয়া অবস্থান করিতেছিল। বামাবৃন্দের বিকট গর্জ্জনে হনূমান চমকিত হইল। হনূমান ভাবিল,—মায়াবী রাক্ষসেরা

সম্ভবতঃ মায়াবলে স্ত্রীলোকের বেশ ধরিয়া এই গভীর রাত্রিতে যুদ্ধে আসিয়াছে। হনূমান ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। কহিল,—"কেরে তোরা? এই গভীর রাত্রে এখানে আসিয়া মরিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিস্? এই দ্বারে আমি স্বয়ং রঘুদাস হনূমান জাগিয়া রহিয়াছি। স্বয়ং রঘুনাথ রামচন্দ্র, তদীয় ভ্রাতা লক্ষ্মণ এবং মিত্র বিভীষণ শিবিরাভ্যন্তরে জাগরিত আছেন। তোরা এ সময়ে রমণীর বেশ ধারণ করিয়া নিশ্চয়ই মরিবার জন্য সমুপস্থিত হইয়াছিস্। আমি বলিতেছি, তোরা সত্বর তোদের আত্মপরিচয় দে, নচেৎ আমার এই ভীম মুষ্ট্যাঘাতে এখনই তোদের এক এক জনের মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিব।" এই বলিয়া হনূমান নৃমুণ্ড-মালিনীর দিকে তাহার সেই ভীষণ বজ্রমুষ্টি উত্তোলন করিল।

নৃমুণ্ডমালিনী তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া কহিল,—"রে বর্ব্বর, সাবধান!—বানরের নিকটে আর আত্মপরিচয় কি দিব? তোর প্রভু রঘুনাথকে শীঘ্র

এখানে ডাকিয়া লইয়া আয়। ক্ষুদ্রজীবি বানর তুই,—তোকে মারিয়া আর আমাদের কি হইবে ? শৃগালের সঙ্গে সিংহীর বিবাদ নিতান্তই অশোভনীয়। তুই শীঘ্র গিয়া তোর প্রভু রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ আর রাক্ষস কুলাঙ্গার বিভীষণকে এখানে ডাকিয়া আন্। তোর প্রভুকে গিয়া বল্ যে মেঘনাদ-পত্নী প্রমীলা এক্ষণে পতিপদ পূজিবার জন্য লঙ্কা প্রবেশাভিলাষিণী, হয় সসম্মানে তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দাও, নয়ত তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হও।”

হনুমান এই বীরাঙ্গনার উক্তি শুনিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ নেত্রে তাঁহাদিগের দিকে চাহিয়া রহিল। হনুমান কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিল,—বীরাঙ্গনা-দিগের মধ্যভাগে রক্ষঃকুলবধূ প্রমীলা এক অপূর্ব্ব সাজে সুসজ্জিতা। হনুমান ভাবিতে লাগিল,—লঙ্কাপুরে কত অপূর্ব্ব সুন্দরী রাক্ষসরমণী দেখিয়াছি, রাবণের শত শত মহিষী, এমন কি রাণী মন্দোদরীকে পর্য্যন্ত আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কিন্তু প্রমীলার এই সৌন্দর্য্যের ন্যায় এমন অপূর্ব্ব তেজ-মণ্ডিত

রূপমাধুরী ত আমি কোথাও প্রত্যক্ষ করি নাই! হনূমান মনে মনে বলিল,—"ধন্য মেঘনাদ ; এই স্থির-সৌদামিনী সর্ব্বাংশে তোমারই উপযুক্ত।"

বিস্ময়াবিষ্ট হনূমান অতঃপর প্রমীলার দিকে চাহিয়া বিনীত ভাবে কহিল,—"ভদ্রে! সীতা-শোকাতুর শ্রীরামচন্দ্র বহু কষ্টে সাগর লঙ্ঘন করিয়া সীতার উদ্ধার কামনায় আজ লঙ্কাপুরে সমুপস্থিত হইয়াছেন। লঙ্কার রাক্ষসরাজের সহিতই তাঁহার বিরোধ। কিন্তু আজ আপনাদিগের ন্যায় অবলারা এই যুদ্ধস্থলে কেন যে এইরূপ যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হইয়া সমাগত হইয়াছেন, বুঝিতে পারিতেছি না। শ্রীরামচন্দ্র দয়ার সাগর বলিয়া পরিচিত। আপনা-দিগের সহিত কোনরূপ বিরোধ সংঘটিত হওয়া নিশ্চয়ই তাঁহার অনভিপ্রেত। প্রভু রামচন্দ্রের নিকট আপনার যাহা বক্তব্য আছে, অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট প্রকাশ করুন। আমি এখনই প্রভুর চরণে তাহা নিবেদন করিব। আমাকে আপনা-দিগের অভিপ্রায় জ্ঞাত করুন।"

প্রমীলা হনূমানের সৌজন্যে আপ্যায়িতা হইয়া সুধাস্বরে উত্তর করিলেন,—"রামচন্দ্রের সঙ্গে আমাদের কিছুমাত্র বিরোধ নাই। রামচন্দ্র আমার পতি-বৈরী সন্দেহ নাই। কিন্তু তজ্জন্য আমিও আজ তাঁহার সঙ্গে শত্রুতা করিতে চাহি না, আমার স্বামী নিজেই বাহুবলে ভুবন-বিজয়ী। সুতরাং তাঁহার শত্রুর সঙ্গে আমার বিন্দুমাত্রও যুদ্ধ-সাধ নাই। তবে সম্প্রতি আমরা লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিব বলিয়া সংকল্প করিয়াছি। শ্রীরামচন্দ্র আমাদিগকে সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া না দিলে তাঁহার সহিত আমাদিগের যুদ্ধ অনিবার্য্য। যাহা হউক, তুমি আমার এই নৃমুণ্ডমালিনী নাম্নী দূতীকে সঙ্গে লইয়া শ্রীরামচন্দ্রের নিকট গমন কর। আমার যাহা বক্তব্য আছে,—দূতীই তাহা শ্রীরামচন্দ্রের নিকট সমস্ত বিবৃত করিবে।"

হনূমান নৃমুণ্ডমালিনীকে সঙ্গে লইয়া শ্রীরামচন্দ্রের শিবিরে উপস্থিত হইল। দানবীর সেই ভৈরবী মূর্ত্তি দেখিয়া শিবিরের সকলেই প্রাণের ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন।

নৃমুণ্ডমালিনী মনে মনে হাস্য করিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে অভিবাদন করিয়া কহিল,—"আমার নাম নৃমুণ্ডমালিনী—আমি যুবরাজ-মহিষী প্রমীলাসুন্দরীর দূতীরূপে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। প্রমীলা পতিপদ পূজা করিবার মানসে এক্ষণে লঙ্কাপুরে প্রবেশাভিলাষিণী হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। আপনি হয় আমাদিগকে সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিন, নচেৎ তাঁহার সঙ্গে আসিয়া যুদ্ধ করুন। আমরা সকলেই যুদ্ধার্থ প্রস্তুত আছি।"

শ্রীরামচন্দ্র বিস্মিত হইয়া উত্তর করিলেন,—"দূতী, তোমাদের যুবরাজ-মহিষীকে গিয়া আমার সসম্ভ্রম অভিবাদন জ্ঞাপন কর। তোমরা কুলবালা ও কুলবধূ। অবলাগণের সঙ্গে আমার কিছুমাত্রও বিরোধ নাই। সতী প্রমীলা দেবীকে নিঃসঙ্কোচে লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিতে বল, আমি এখনই সসম্মানে তোমাদিগকে পথ ছাড়িয়া দিবার জন্য আদেশ দান করিব। বীরাঙ্গনে, আমি তোমাদের যুবরাজ-মহিষীর এবম্বিধ পতিভক্তি ও বীরপণার শতমুখে

প্রশংসা করিতেছি। তোমরা নির্ব্বিঘ্নে সকলে রাজধানীতে প্রবেশ কর, ইহাই আমার আশীর্ব্বাদ।”

এই বলিয়া রামচন্দ্র হনূমানকে সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিতে আদেশ দান করিলেন।

নৃমুণ্ডমালিনী শ্রীরামচন্দ্রকে অভিবাদন করিয়া শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রমীলার নিকট আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। প্রমীলা সখীবৃন্দকে লইয়া রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

বিভীষণ শ্রীরামচন্দ্রকে কহিলেন,—“মিত্রবর, এই সময় একবার শিবির হইতে বাহির হইয়া রক্ষঃকুলবধূ প্রমীলার অপূর্ব্ব মধুর সৌন্দর্য্য এবং অপূর্ব্ব পরাক্রম স্বচক্ষে আসিয়া দর্শন করুন।”

রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ বিভীষণের বাক্যে নিতান্ত কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া শিবির হইতে বহির্গত হইলেন। বাহির হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে শ্রীরামচন্দ্র বিস্মিত হইলেন। দেখিলেন,—শ্রেণীবদ্ধ সশস্ত্র বীরাঙ্গনাগণ সুসজ্জিত ও সুবৃহৎ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া চলিয়াছেন। অশ্বসকল নাচিতে নাচিতে

চলিয়াছে। সেই সঙ্গে বীরাঙ্গনাদিগের কটিবদ্ধ অসি ঝঞ্চনা দিয়া উঠিতেছে। বীরাঙ্গনাদিগের মধ্য ভাগে মেঘনাদ-পত্নী প্রমীলাসুন্দরী এক অপূর্ব্ব সাজে শোভা পাইতেছেন।

রামচন্দ্র বিভীষণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"মিত্র, এ কি স্বপ্ন না ইন্দ্রজাল,—তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। এমন অপূর্ব্ব তেজোব্যঞ্জক মধুর রূপ এই ত্রিভুবনের কোথাও আছে কি না জানি না। সখে, যাহা দেখিতেছি, তাহা যদি স্বপ্ন না হয়, তবে প্রমীলার সবিশেষ পরিচয় আমাকে জ্ঞাপন কর।"

বিভীষণ কহিলেন,—"সখে, ইহা স্বপ্ন নহে। প্রমীলা সুমাত্রাধিপতি কালনেমীর একমাত্র কন্যা। ভবানীর বরে কালনেমী এই অমূল্য কন্যারত্ন লাভ করিয়াছেন। রূপলাবণ্য, গুণগরিমা ও তেজস্বিতায় প্রমীলার ন্যায় রমণী বস্তুতঃই পৃথিবীতে দুর্ল্লভ।"

রামচন্দ্র কহিলেন,—"সখে, তুমি যাহা বলিলে সকলই যথার্থ। মেঘনাদ প্রকৃতই মহাভাগ্যবান্। প্রমীলা মহাবীর মেঘনাদেরই উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী।"



প্রমীলার লঙ্কা প্রবেশ

শিশু প্রেস।

বিস্ময়বিমুগ্ধ রঘুসৈন্যগণ চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় সেই অদ্ভুত দৃশ্য অবলোকন করিতে লাগিল। বীরাঙ্গনাগণ তাঁহাদের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিলে শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন।

লঙ্কার অধিবাসিগণ এই অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করিবার জন্য দলে দলে রাজপথে ধাবমান্ হইল। রাক্ষস-বধূরা গবাক্ষ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিয়া প্রমীলার অভ্যর্থনা করিল। বন্দীগণ প্রমীলার জয়-ধ্বনিতে নিশীথ গগন প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল।

সতী সাধ্বী প্রমীলা আপনার অলৌকিক তেজঃ-প্রভায় চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া এবং রণবাদ্যের গম্ভীর শব্দে রাজপথ মুখরিত করিয়া সঙ্গিনীগণের সঙ্গে রাজপুরী অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।



অষ্টম পরিচ্ছেদ।



দম্পতীর পুনর্ম্মিলন।



মেঘনাদ পিতৃকর্ত্তৃক সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইয়া একদিকে যেমন আনন্দিত হইলেন, অন্য. দিকে সেই দিন যুদ্ধে যাইতে পারিলেন না বলিয়া আবার একটুকু ক্ষুণ্ণ হইলেন।

তিনি প্রমীলাকে বলিয়া আসিয়াছেন,—আমি যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া এখনই আবার ফিরিয়া আসিব। কিন্তু কাল প্রাতে যজ্ঞ শেষ করিয়াই যুদ্ধ যাত্রা করিতে হইবে। সুতরাং আজ এই নিশীথে কেমন করিয়াই বা সেই প্রমোদ-উদ্যানে যান? যদি যান, তবে পিতাই বা কি মনে করিবেন?

এই সকল কথা চিন্তা করিয়া যুবরাজ বড়ই ব্যাকুল হইতেছেন। পতিগতপ্রাণা প্রমীলার জন্যই আজ তাঁহার চিন্তা বেশী। প্রমীলা এতক্ষণে হয়ত

উতলা হইয়া উঠিয়াছে। প্রমীলা সম্ভবতঃ নানারূপ অমঙ্গল চিন্তা করিয়া নয়নজলে ভাসিতেছে, যুবরাজ এই সকল কথা চিন্তা করিয়া একান্তই ব্যথিত হইতেছেন।

পত্নীর নিকট তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুতি যে রক্ষা করিতে পারিলেন না, এই ভাবনায় তাঁহার আর নিদ্রা আসিল না। তিনি সুকোমল পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে রাজপথে সহসা রণবাদ্যের ধ্বনি পরিশ্রুত হইল। যুবরাজ মনে করিলেন,—হয়ত রাক্ষসসৈন্যগণ কালিকার যুদ্ধায়োজনে নিরত আছে। কিন্তু আবার সহসা তিনি শত শত বীরবামাকণ্ঠ-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন।

যুবরাজ লম্ফ দিয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি সেই উচ্চ প্রাসাদ-শিখরে আরোহণ করিলেন। রাজপথের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি যাহা দেখিলেন তাহাতে বিস্মিত হইলেন। দেখিলেন,—যাঁহার চিন্তায় তিনি এই গভীর

নিশীথে মহা ব্যাকুল হইতেছিলেন, তাঁহার সেই প্রাণাধিকপ্রিয়তমা পত্নী প্রমীলাসুন্দরী এক অপূর্ব্ব বেশে সুসজ্জিতা হইয়া রণ-রঙ্গিণী মূর্ত্তিতে এক বিরাট শোভাযাত্রা সহ অশ্বারোহণে রাজপুরীর দিকে অগ্রসর হইতেছেন। যুবরাজ সতী সাধ্বী প্রমীলার এবম্বিধ বীরপণা ও পতিপ্রাণতায় মুগ্ধ হইলেন। বিস্ময়বিমুগ্ধ নেত্রে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি বীরাঙ্গনাগণের সেই অদ্ভুত শোভাযাত্রাদৃশ্য দর্শন করিলেন। পরে সেই প্রাসাদ-শিখর হইতে অবতরণ করিয়া আপনার শয়ন-মন্দিরে পুনঃ প্রবেশ করিলেন।

প্রমীলা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া লঙ্কার সেই সুরম্য রাজপুরীতে প্রবেশ করিলেন এবং অবিলম্বে সেই বীরবেশেই স্বামীর শয়ন-মন্দিরে উপনীত হইলেন। মণিহারা ফণী যেন তাহার হারাধন ফিরিয়া পাইল। প্রমীলা গৃহে প্রবেশ করিয়া স্বামীর চরণে প্রণাম করিলেন। মেঘনাদ দুই হস্তে পত্নীকে ধরিয়া তুলিলেন, কৌতুক করিয়া

কহিলেন,—"দেবী, তুমি চামুণ্ডা চণ্ডিকা রূপে আজ রক্তবীজ অসুরদিগকে বধ করিয়া কৈলাস ধামে আসিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছ,—যদি আজ্ঞা হয়, বল, আজ আমি মহাদেবের ন্যায় তোমার ঐ রাঙ্গা চরণ তলে লুটাইয়া পড়িয়া থাকি!"

প্রমীলা বাধা দিয়া কহিলেন,—"ছিঃ নাথ, ও কথা মুখে আনিও না, আমি যে তোমার দাসী, প্রাণেশ্বর! প্রিয়তম, তোমার আশীর্ব্বাদে এ দাসী ভব-বিজয়িনী সন্দেহ নাই, কিন্তু নাথ, সেই বিজয়ের অঞ্জলি তোমারই চরণে নিবেদন করিবার নিমিত্ত দাসীর হৃদয় চিরব্যাকুল। তাই নাথ, আজ তোমার বিরহিনী প্রমীলা এই গভীর নিশীথে ভক্তি ও প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি দিবার উদ্দেশ্যে, রামের সমর-তরঙ্গ উপেক্ষা করিয়াও লঙ্কায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে।"

মেঘনাদ পত্নীর ললাট চুম্বন করিয়া প্রেমভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। প্রমীলা কহিলেন,—"নাথ, যে জন্য এ বেশ, তাহা ত পাইয়াছি, এখন আর

এ বেশ রাখিব কেন ?” এই বলিয়া প্রমীলা কক্ষান্তরে গমনপূর্ব্বক সমরসজ্জাসকল ত্যাগ করিয়া আবার কুলবধূর পরিচ্ছদ সকল পরিধান করিলেন। সর্ব্বাঙ্গে সমুজ্জল রত্নালঙ্কার সমূহ শোভা পাইতে লাগিল। পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া আসিয়া দৈত্য-বালা আবার পতির পদে প্রণতা হইলেন। মেঘনাদ প্রমীলার এই অপূর্ব্ব রূপান্তর মাধুরী দেখিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন।

কহিলেন,—“প্রমীলে, প্রিয়তমে, সকল প্রকার সৌন্দর্য্যই তোমাকে পাইলেই সুন্দর হয় !” প্রমীলা প্রেমাবেশে প্রিয়তম পতির কণ্ঠলগ্ন হইলেন।

প্রমীলার নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু সকল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। যুবরাজ প্রমীলার অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া তাঁহার সেই আরক্ত অধরে আদরে চুম্বন করিলেন। প্রমীলাও আনন্দ-আবেগে স্বামীর এই ঋণ পরিশোধ করিয়া ধন্য হইলেন।

হাস্য-কৌতুক ও কথোপকথনে দম্পতীর বহুক্ষণ অতিবাহিত হইল। অতঃপর প্রমীলা যুদ্ধের কথা

জানিতে চাহিলেন। মেঘনাদ কহিলেন,—"পিতা আমাকে সেনাপতি পদে বরণ করিয়াছেন। কালি প্রভাতে ইষ্ট দেবতার অর্চ্চনা সমাপণান্তে আমি যুদ্ধ যাত্রা করিব। তুমি প্রার্থনা করিও,—এই মহা যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া আমি যেন লঙ্কার গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারি।"

প্রমীলা কহিলেন,—"প্রিয়তম, শ্বশুর মহাশয়কে এই যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য কোন অনুরোধ করিয়াছিলে কি?"

মেঘনাদ কহিলেন,—"প্রিয়ে, ভ্রাতা বীরবাহুর মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণে পিতা যেরূপ উত্তেজিত হইয়াছেন, তাহাতে এই যুদ্ধ হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে, এমন লোক এই ত্রিভুবনে কেহই জন্ম গ্রহণ করে নাই। প্রিয়তমে, রাম লক্ষ্মণ যেরূপ অন্যায় সমরে বালক বীরবাহুকে বধ করিয়াছে বলিয়া শ্রবণ করিয়াছি, তাহাতে আমি পিতাকে প্রতিনিবৃত্ত করাও আর সঙ্গত বোধ করি নাই। ললনে, তুমি ব্যাকুলা হইও না,

আর পিতাকেও এই যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া তাঁহার ক্রোধের কারণ হইও না। তুমি দেখিবে,—আমি অনতিবিলম্বেই কুলাঙ্গার বিভীষণ সহ রামলক্ষ্মণকে বন্দী করিয়া আনিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত করিব। প্রাণাধিকে, তুমি কেবল বীরপত্নী নহ, অধিকন্তু তুমি বীরাঙ্গনা; অতএব এই সামান্য মনুষ্যের যুদ্ধে তুমি এত আকুলা হইতেছ কেন প্রিয়ে?”

প্রমীলা কহিলেন,—“নাথ, রাম লক্ষ্মণ সহজ পাত্র বলিয়া ত আমার নিকট বোধ হইতেছে না। যাঁহাদের যুদ্ধে মহাবীর খুল্লতাত কুম্ভকর্ণ এবং বীরচূড়ামণি বীরবাহু নিহত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে তুমি সহজ যোদ্ধা বলিয়া মনে করিও না। প্রাণাধিক, আমার মনে হইতেছে যে এই যুদ্ধেই আমাদের এই স্বর্ণলঙ্কা ছারখার হইবে। লঙ্কার যে কি এক বিষম অমঙ্গল সাধিত হইবে, বলিতে পারি না। নাথ, এখনও তোমরা এই অন্যায় যুদ্ধ হইতে বিরত হও, ইহাই আমার একমাত্র অনুরোধ।”

মেঘনাদ কহিলেন,—"বীরাঙ্গনে, তুমি অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া কাতরা হইতেছ কেন? বিধাতা যাঁহার অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তাহাকে নিশ্চিতই ভোগ করিতে হইবে। বিধাতৃ-বিধান অলঙ্ঘনীয়। যদি এই যুদ্ধে আমার প্রাণ যায়,—যাইবে; পিতৃ আদেশ এবং স্বর্ণ-লঙ্কার মঙ্গলের জন্য মৃত্যু আলিঙ্গন করিয়াও ত আমি সুখী হইব প্রিয়ে! মেঘনাদের পক্ষে সেই-ই ত পরম গৌরব। আর শুন প্রিয়তমে, যুদ্ধোদ্যত-বীর পতিকে যুদ্ধ গমনে বাঁধা দেওয়া কি তোমার ন্যায় বীর পত্নীর পক্ষে শোভনীয়? কেন, প্রিয়ে, তোমার কিসের ভয়, প্রিয়তমে?"

প্রমীলা উত্তর করিলেন,—"নাথ, যাঁহার পতি যোদ্ধা, তাহার প্রাণে যে কত ভয়, তাহা অপরে কি বুঝিবে? নাথ, তুমি ভাবিয়া দেখ, এ ভয় কেবল যে আমার নিজের জন্য, তাহা নহে,—তোমার যুদ্ধে যে সকল সৈন্য বিনষ্ট হইবে, তাহাদের পরিবার পরিজনের দুঃখের কথা ভাবিলেও আমার প্রাণ

ফাটিয়া যায়। হৃদয়সর্ব্বস্ব, এখন একবার ভাবিয়া দেখ বীরপত্নীর কিসের ভয়? বীরপত্নীর যে কত ভয়, তাহা অপরের জানা সম্পূর্ণ অসম্ভব।”

মেঘনাদ প্রমীলার অন্তঃকরণের এইদৃঢ়তা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কহিলেন,—“প্রিয়ে, তুমিই ধন্য। আচ্ছা; তুমি চিন্তা করিয়া আর উদ্বিগ্না হইও না। আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া যাইতেছি যে আমি এই যুদ্ধে কাহাকেও প্রাণে বধ করিব না। তুমি এখন নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাও।”

প্রমীলা কহিলেন,—“হৃদয়েশ্বর, তোমার কথায় এক্ষণে অনেকটা আশ্বস্তা হইলাম। এই প্রতিশ্রুতির কথা কিন্তু যুদ্ধকালে কখন বিস্মৃত হইও না। নাথ! আমার প্রার্থনা,—কাল যুদ্ধ যাত্রার পূর্ব্বে যজ্ঞাগারে গিয়া আমি তোমায় মনের মত করিয়া যোদ্ধৃবেশে সজ্জিত করি।”

মেঘনাদ কহিলেন,—“প্রিয়ে, তাহা ত আমার পরম সৌভাগ্য। আমি কালি প্রভাতে জননীর আদেশ লইয়া যজ্ঞাগারে গমন করিব। তিনি অনুমতি

দিলে আমি নিশ্চয়ই তোমকে সঙ্গে করিয়া যজ্ঞাগারে লইয়া যাইব। যজ্ঞান্তে তুমি তোমার মনের মতন করিয়া আমাকে বীরসাজে সজ্জিত করিও।”—এই বলিয়া মেঘনাদ শয়ন করিলেন। প্রমীলাও পতির অঙ্কশায়িনী হইয়া নিদ্রিতা হইলেন।



নবম পরিচ্ছেদ।

যুবরাজের যুদ্ধ-যাত্রা।

রাত্রি প্রভাতা হইল। লঙ্কার ঘরে ঘরে রাক্ষসেরা যুবরাজের জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। সেই বিকট জয়-জয় নাদে যুবরাজের নিদ্রাভঙ্গ হইল। প্রমীলার সমস্ত রাত্রি দুশ্চিন্তায় ভাল নিদ্রা হয় নাই। প্রমীলা পূর্ব্বেই শয্যা হইতে উঠিয়াছিলেন। মেঘনাদও শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন।

প্রাতঃকৃত্য সমাপণান্তে যুবরাজ প্রমীলাকে কহিলেন,—"প্রিয়ে, এখন চল, জননীর নিকটে বিদায় লইয়া আসি। জননীর অনুমতি গ্রহণ করিয়া যথাবিধি ইষ্টদেবতার পূজা করিব। তৎপর রামের সমর-সাধ মিটাইবার জন্য যুদ্ধ-যাত্রা করিব।"

মেঘনাদ ও প্রমীলা মনোহর বেশে সুসজ্জিত হইয়া শিবিকারোহণে মাতৃসন্দর্শনে যাত্রা করিলেন।

শিবিকা মহিষী মন্দোদরীর স্বুবর্ণ-মন্দিরদ্বারে উপনীত হইলে দম্পতী শিবিকা হইতে অবতরণ করিলেন।

ত্রিজটা নাম্নী একজন পরিচারিকা মন্দোদরীর মন্দির-দ্বারে প্রহরা কার্য্যে নিযুক্তা ছিল। যুবরাজ ও বধূমাতা প্রমীলাকে দেখিয়া সে শশব্যস্তে তাঁহা-দিগের নিকট আগমন করিল।

যুবরাজ ত্রিজটাকে কহিলেন,—"ত্রিজটে, পিতার আদেশে আজ আমি নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সমাপনপূর্ব্বক রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার সংকল্প করিয়াছি। সেই জন্য এক্ষণে মাতৃ-আশীর্ব্বাদ লইতে আসিয়াছি। তুমি জননীকে সংবাদ দাও,—তোমার পুত্র ও পুত্রবধূ তোমার শ্রীচরণদর্শনাকাঙ্ক্ষায় দ্বারে দণ্ডায়মান।"

ত্রিজটা উত্তর করিল,—"যুবরাজ, তোমাদের মঙ্গলার্থ রাণীমাতা এক্ষণে শিব-মন্দিরে শিবপূজা করিতেছেন। আমি যাই,—পূজা শেষ হইবামাত্রই তোমাদিগের এই আগমন বার্ত্তা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিব। চল,—তোমাদিগকেও শিব-মন্দিরের নিকট লইয়া যাই।"

দম্পতী হৃষ্টচিত্তে পরিচারিকার সহিত মন্দির-প্রাঙ্গণে গমন করিলেন। রাণী মন্দোদরী শিবপূজা সমাপনান্তে মন্দিরাভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়াই পুত্র ও পুত্রবধূকে দ্বারে দণ্ডায়মান দেখিলেন। দম্পতী জননীকে প্রণাম করিলেন। রাণী উভয়-কেই সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

যুবরাজ কহিলেন,—"মা, নিকুম্ভিলা যজ্ঞ শেষ করিয়া আজ আমি যুদ্ধ-যাত্রা করিবার সংকল্প করিয়াছি। পিতার অনুমতি পাইয়াছি,--আপনার অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ পাইলেই এখন আমি যজ্ঞাগারে গমন করিতে পারি। মা, আপনার পদধূলি ও আশীর্ব্বাদ পাইলে আমি আর পৃথিবীর কাহাকেও ভয় করি না। আপনি অনুমতি দিন,—আমি লঙ্কাকে আজই নির্ব্বিঘ্ন করিয়া আসি।"

রাণী উত্তর করিলেন,—"বাছা, তোকে সেই মহাযুদ্ধে যাইতে আমি কেমন করিয়া অনুমতি দিব,—তুই যে আমার হৃদয়াকাশের পূর্ণচন্দ্র। বৎস, রামলক্ষ্মণ উভয়েই ভীষণ যোদ্ধা, তাহাতে

আবার দুরাত্মা বিভীষণ তাহাদিগের পথ-প্রদর্শক। কুলাঙ্গার বিভীষণ ক্ষুধিত শার্দ্দুলের ন্যায় আজ আপনার স্ববন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনকেই অনায়াসে বধ করিতেছে! বৎস, কুল-কলঙ্ক বিভীষণের জন্যই আজ এই স্বর্ণ-লঙ্কার এ দশা! আমি মা হইয়া তোমার মত বুকের ধনকে এই ভীষণ যুদ্ধে কেমন করিয়া পাঠাইব বৎস?"

মেঘনাদ উত্তর করিলেন,—"মা, আপনি ত বীরপুত্রের জননী। আপনি রামলক্ষ্মণ ও তাত বিভীষণকে ভয় করিতেছেন কি জন্য মা? আপনার অনুমতি পাইলে আমি আজই রামলক্ষ্মণ এবং রাজদ্রোহী বিভীষণকে বন্দী করিয়া আনিব। মা, আপনার এই ভুবনবিজয়ী বীরপুত্রকে ছার নর-বানরের যুদ্ধে প্রেরণ করিতে আজ আপনি এত শঙ্কিত হইতেছেন? আপনার অনুমতি না পাইলে আমি কেমন করিয়া যাই মা? পুত্রের এ সাধ কি পূর্ণ করিবেন না মা?"

মা পরম আদরে পুত্রের শিরশ্চুম্বন করিয়া কহিলেন,—“বৎস, রামলক্ষ্মণ পরম মায়াবী, নতুবা এই অলঙ্ঘ্য সাগরের উপর আজ তাহারা এইরূপ বিরাট সেতু নির্ম্মাণ করিল কিরূপে? বীরবাহুর শোকে আজও আমরা কাতর বৎস,—তুমি এই যুদ্ধ সাধ ত্যাগ কর। এই ভীষণ কাল-সময়ে তোমাকে কেমন করিয়া আমি পাঠাইব বৎস?”

মেঘনাদ কহিলেন,—“মা, আপনি পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া আর বিষণ্ণা হইবেন না। শিশু বীরবাহুকে বধ করা কিছুতেই বীরত্বের পরিচায়ক নহে। মা, আপনি আজ সন্তুষ্ট চিত্তে আমাকে বিদায় দিন। আপনার আশীর্ব্বাদ পাইলে আমি ত্রিভুবন জয় করিতে পারি মা,—রামলক্ষ্মণ ত তুচ্ছ কথা! মা, যুদ্ধে না যাইয়া আমি কেমন করিয়া আজ ঘরে বসিয়া থাকিব? নগর দ্বার শত্রু সৈন্য দ্বারা অবরুদ্ধ। এ সময় কে ঘরে বসিয়া থাকে মা? শয়ন-গৃহে অগ্নি লাগিলে কার

সাধ্য সে গৃহে নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যায় না ? আপনি অনুমতি করুন—আমি এই মহা সমর জয় করিয়া আজ লঙ্কার গৌরব রক্ষা করি।”

মন্দোদরী উত্তর করিলেন,—“বৎস, যদি একান্তই তোমার যুদ্ধ-সাধ হইয়া থাকে,তবে আর আমি তোমাকে নিবারণ করিব না। মহাদেবের চরণে প্রার্থনা,—তিনি তোমার সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল বিধান করুন। বৎস,যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে যজ্ঞাগারে গিয়া প্রথমে যথাবিধি ইষ্টদেবতার অর্চ্চনা কর।”

এই বলিয়া মাতা পুত্রের মস্তক স্পর্শ করিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। মেঘনাদ হৃষ্ট চিত্তে মাতৃপদধূলি মস্তকে লইয়া গগনোন্মুখ হইলেন।

রাণী মন্দোদরী পুত্রবধূ প্রমীলার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিলেন। পুত্রবধূকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন,—“মা, তুমি এখন আমার কাছেই থাক। পুত্রের অনুপস্থিতে তোমার এই অনিন্দ্য সুন্দর প্রীতি-ঢল-ঢল মুখখানি

দেখিয়াই আমার এ তাপিত প্রাণ শীতল করিব মা।”

প্রমীলা সুশীলা কুলবধূ। শ্বশ্রূমাতার কথায় তাঁহার আর দ্বিরুক্তি করিবার শক্তি রহিল না। প্রমীলা তাঁহার স্নেহপ্রবণহৃদয়া শ্বশ্রূর কথায় মৌন রহিয়া সম্মতি জানাইলেন।

মেঘনাদ জননীর চরণ বন্দনা করিয়া যজ্ঞশালার দিকে অগ্রসর হইবেন, এমনসময়ে সহসা তাঁহার প্রণয়িনী প্রমীলার সেই চিরপরিচিত সুমধুর নূপুর শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। মেঘনাদ পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন,—প্রমীলা তাঁহারই দিকে আসিতেছে। প্রমীলার নেত্র ছল ছল। মেঘনাদ ফিরিয়া প্রমীলাকে বাহু পাশে বদ্ধ করিলেন।

প্রমীলা কহিলেন,—“নাথ, বড়ই আশা ছিল, যজ্ঞশালায় গিয়া তোমাকে বীরসাজে সজ্জিত করিব। কিন্তু আমার সে আশা আর পূর্ণ হইল না। শ্বশ্রূমাতা আমাকে তাঁহার

নিকটে থাকিবার জন্য আজ্ঞা করিলেন। নাথ, শ্বশ্রূমাতা কার্য্যান্তরে গমন করিবা মাত্রই আর একবার তোমার এই শ্রীচরণদর্শনাকাঙ্খায় আসিয়াছি। হৃদয়ারাধ্য, তুমি ছাড়া এ পৃথিবী আমার কাছে অন্ধকার, এ কথা মনে রাখিও।”

প্রমীলার সেই মুক্তামণ্ডিত পীনোন্নত বক্ষদেশ অশ্রুধারায় প্লাবিত হইল। মেঘনাদ প্রমীলার অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া কহিলেন,—“প্রিয়ে, তুমি এই যাত্রাকালে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া অমঙ্গল সূচনা করিও না। আমি শীঘ্রই যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া আসিয়া তোমার আনন্দ বর্দ্ধন করিব।”

প্রমীলার অশ্রু আর নিবারিত হইল না। মেঘনাদের পক্ষেও তখন আর পত্নীর অশ্রুজলে দৃষ্টিপাত করিবার সময় ছিল না। যুবরাজ অশ্রুসিক্তা পত্নীকে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা দান করিয়া বহু কষ্টে তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

প্রমীলা স্বামীর কল্যাণের জন্য দেবী ভগবতীকে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিলেন,—

"মা দুর্গে, লঙ্কারদিকে একবার কৃপাদৃষ্টিপাত কর মা। কৃপাময়ি,এই মহাযুদ্ধে আমার স্বামীর কল্যাণ বিধান কর,—দেখিও মা, এ যুদ্ধে আমার স্বামীর যেন কোনরূপ অমঙ্গল না হয়।"

সতীর প্রার্থনায় কৈলাসে ভগবতীর প্রাণ কাঁদিল। ভগবতী মহাদেবকে কহিলেন,—"প্রভু, দৈত্যবালা প্রমীলার কাতর প্রার্থনায় আমি বড়ই বিচলিতা হইয়াছি। আপনি আজিকার যুদ্ধে মেঘনাদের মঙ্গল বিধান করুন প্রভু।"

শিব উত্তর করিলেন,—"দেবি, দেবরাজ ইন্দ্র আসিয়া পূর্ব্বেই মেঘনাদ এই যুদ্ধে নিহত হইবে বলিয়া বর লইয়া গিয়াছেন। সুতরাং আজিকার যুদ্ধে মেঘনাদের কল্যাণ বিধান এখন আমার পক্ষে অসম্ভব। হায়, রাবণের দুঃখে আমি নিরন্তর অভিভূত! কিন্তু কি করিব,— উপায় নাই। রাবণ আপনার দোষেই আজ সবংশে মজিতে বসিয়াছে! কর্ম্মফল সকলকেই ভুগিতে হয়। পিতার দোষে আজ নিরপরাধ

পুত্র মরিবে। দেবি, তুমি অসন্তুষ্ট হইও না। প্রমীলা আমাদের সন্তানতুল্যা স্নেহাস্পদা। প্রমীলার দুঃখে আজ আমার প্রাণও বিদীর্ণ হইতেছে। সতি, বিধাতার বিধান অলঙ্ঘনীয়। তাহাদিগের অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা তাহাদিগকে ভুগিতেই হইবে। মেঘনাদের আজিকার বীরত্বে সমস্ত পৃথিবী চমকিত হইবে। মেঘনাদের স্বদেশপ্রেম, পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তির কাহিনী এবং প্রমীলার বীরপণা ও পতিপ্রাণতার অপূর্ব্ব কথা ভারতের ঘরে ঘরে পরিকীর্ত্তিত হইবে। মেঘনাদ আজিকার যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিলে পতি-গতপ্রাণা সতী সাধ্বী প্রমীলাও পতির অনুগামিনী হইবে। দেবি, এই দম্পতী দেহান্তে কৈলাসে আসিয়া অতঃপর অক্ষয় সুখ-সম্ভোগ করিবে। প্রিয়ে, আমি দম্পতীকে যথাকালে কৈলাসে আনিবার জন্য দেব হুতাশনকে আদেশ করিয়া রাখিয়াছি।”

ভগবতী সকাতরে কহিলেন,—“আপনার পরম ভক্ত, নিরপরাধ, দৈত্যরাজ কালনেমী ও সর্ব্বগুণ-

বিভূষিতা রাণী রম্ভাবতীর কি দশা হইবে প্রভু ?”

মহেশ্বর উত্তর করিলেন,—“দেবি, কন্যাগতপ্রাণ কালনেমী ও তাঁহার মহিষী উভয়েই জামাতা-কন্যার মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণে প্রাণত্যাগ করিবে। আমি তাহাদিগকেও কৈলাসধামে আনিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি।”

ভগবতী করযোড়ে কহিলেন,—“প্রভু, আপনাকে আর অধিক কি বলিব,—দেখিবেন, আপনার ভক্ত-বৎসল নামে যেন কোন কলঙ্ক না স্পর্শে।”



দশম পরিচ্ছেদ।



অন্তিম শয্যায় মেঘনাদ।



এদিকে শ্রীরামচন্দ্রের শিবিরেও রাত্রি প্রভাতা হইল। রাক্ষসবৃন্দের বিকট জয়-জয় নাদে রাঘব-সৈন্যগণ জাগিয়া উঠিল। সকলেই যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইতে লাগিল। শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার প্রাণের ভাই লক্ষ্মণকে নিজ হস্তে যুদ্ধসাজে সজ্জিত করিলেন। অতঃপর মিত্র বিভীষণকে তিনি লক্ষ্মণের সঙ্গে যাইবার জন্য আদেশ দান করিলেন।

রামচন্দ্র বিভীষণকে কহিলেন,—"মিত্রবর, ভিখারী রাঘব আজ তাঁহার একমাত্র অমূল্যরত্নকে তোমারই হস্তে সমর্পণ করিতেছে। তোমাকে আর অধিক কি বলিব,—আজ আমার জীবন মরণ তোমারই উপর নির্ভর করিতেছে।"

বিভীষণ কহিলেন,—"মিত্রোত্তম,—যেখানে ধর্ম্ম, সেখানেই জয়। পাপে পাপে লঙ্কা আজ ডুবিতে বসিয়াছে। আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। আমরা নিশ্চয়ই আজ সফলকাম হইয়া প্রত্যাগমন করিব।"

এই বলিয়া বিভীষণ শ্রীরামচন্দ্রকে অভিবাদন করিয়া লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া মেঘনাদকে বধ করিবার জন্য নিকুম্ভিলা যজ্ঞশালার দিকে যাত্রা করিলেন। স্বর্গ হইতে মায়াদেবী, দেবরাজের আদেশে, অদৃশ্য-ভাবে তাঁহাদিগের সঙ্গিনী হইলেন।

ইন্দ্রজিৎ সুরম্য যজ্ঞশালার এক নিভৃত প্রকোষ্ঠে তাঁহার প্রাণারাধ্য ইষ্ট দেবতার অর্চ্চনায় নিরত রহিয়াছেন। যজ্ঞশালার বহির্ভাগে অগণিত রাক্ষস সৈন্য অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া প্রহরা কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। লক্ষ্মণ ও বিভীষণ মায়াদেবীর অনুগ্রহে লঙ্কার সেই দুর্ভেদ্য সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া নীরবে সেই যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিলেন।

মহাধ্যানপরায়ণ মেঘনাদ লক্ষ্মণকে প্রত্যক্ষ ইষ্ট দেবতা জ্ঞানে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন।

কিন্তু বিস্মিত মেঘনাদ কিছুতেই তাঁহাকে লক্ষ্মণ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

লঙ্কার সেই অসংখ্য বীরবাহু রাক্ষসসৈন্য পরিবৃত দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর অতিক্রম করা,—মানুষ দূরের কথা, দেবতারও সাধ্যায়ত্ত নহে। মেঘনাদ তাই আবার তাঁহার প্রাণারাধ্য ইষ্ট দেবতা জ্ঞানে গৃহাগত শত্রুর পদতলে পতিত হইয়া অভিলষিত বর প্রার্থনা করিলেন। কহিলেন,—"ইষ্টদেব, আজি মহা শুভক্ষণে আপনার ধ্যানে নিযুক্ত হইয়াছিলাম, তাই আজ আপনার শুভ পদার্পণে এ পুরী পবিত্রীকৃত হইল। কিন্তু আপনার আজ এ বেশ কেন দেব? রক্ষঃকুলরিপু লক্ষ্মণের বেশে আপনার আগমনের কারণ কি প্রভু? আপনার অপূর্ব্ব লীলা বুঝিয়া উঠা আমার সাধ্যাতীত। দেব, এক্ষণে আমার অভীষ্ট বর প্রদান করিয়া আমায় কৃতকৃতার্থ করুন।"

লক্ষ্মণ কহিলেন,—"যুবরাজ, তোমার ভ্রম হইয়াছে,—আমি তোমার ইষ্টদেবতা নহি, পরন্তু তোমার ভয়ঙ্কর শত্রু,—রামানুজ লক্ষ্মণ। আমি

তোমার সহিত যুদ্ধার্থ এখানে আগমন করিয়াছি। তুমি অবিলম্বে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও।”

চিরনির্ভীক মেঘনাদ লক্ষ্মণের এবম্বিধ উক্তি শ্রবণে একটুকু শিহরিয়া উঠিলেন। বিস্ময়ান্বিত হইয়া কহিলেন,—“তুমি যদি সত্য সত্যই লক্ষ্মণ হও, তোমার যুদ্ধ সাধ এখনই আমি মিটাইতেছি। কিন্তু হে বীর, তুমি কি কৌশলে এই অলঙ্ঘ্য প্রাচীর অতিক্রম করিয়া এই যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিলে,—তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না। শত শত সশস্ত্র রাক্ষস নগরদ্বারে দণ্ডায়মান। লঙ্কাপুরীর প্রাচীর পর্ব্বতের মত উচ্চ, আর সেই প্রাচীরোপরি লক্ষ লক্ষ রাক্ষসসৈন্য প্রহরা কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। তুমি কোন্ মায়াবলে সে সকলকে মুগ্ধ করিলে,—জানি না। আমার বোধ হয়, দেব, তুমি আমায় ছলনা করিতেছ। এখনও আত্মপরিচয় দিয়া সেবকের আনন্দ বর্দ্ধন কর। ইষ্টদেব, দয়া করিয়া একবার আমায় অভিলষিত বর প্রদান কর। রামলক্ষ্মণকে লঙ্কা হইতে বিতাড়িত করিয়া আজ

স্বর্ণলঙ্কাকে নিষ্কণ্টক করি। দেব, ঐ শুন আমার সৈন্যগণের শৃঙ্গ-নিনাদ। তাঁহারা সকলেই আমার প্রতীক্ষায় বাহিরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আমি বিলম্ব করিলে আমার সৈন্যগণ হয়ত ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িবে।"

লক্ষ্মণ উত্তর করিলেন,—"রে দুরন্ত,আমি তোর কৃতান্ত লক্ষ্মণ। ঐরূপ বাক্‌চাতুরী ত্যাগ করিয়া এক্ষণে আত্মরক্ষা কর্।" এই বলিয়া লক্ষ্মণ তাঁহাকে আঘাত করিবার জন্য শাণিত তরবারী উত্তোলন করিলেন।

এইবার মেঘনাদের মোহ ভঙ্গ হইল। তিনি লক্ষ্মণকে কহিলেন,—"তুমি আমার পরম শত্রু হইলেও, এক্ষণে আমার গৃহে অতিথি। হে বীর, তুমি যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রথমে আমার আতিথ্য গ্রহণ কর। আমি যুদ্ধবেশ পরিধান করিয়া অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া আসি,—তুমি মুহূর্ত্ত বিলম্ব কর। নিরস্ত্র শত্রুকে আঘাত করা বীরোচিত নহে। হে ক্ষত্রিয় বীর, আশা করি,—এ নিয়ম তোমার অজ্ঞাত নহে।"

লক্ষ্মণ জগদ-গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—"রে রাক্ষস-নন্দন, রাক্ষসের সঙ্গে আবার ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালন করিব কেন? যেরূপে পারি শত্রু নিপাত করিয়া জানকীর উদ্ধার সাধন করিব।"

মেঘনাদ লক্ষ্মণের কাপুরুষতায় ভয়ঙ্কর ক্রোধান্বিত হইলেন। কহিলেন,—"রে লক্ষ্মণ, তুই ক্ষত্রিয়-কুল-কলঙ্ক। তুই তস্করের মত আমার এই গৃহে আসিয়াছিস্। তুই স্থির জানিস,—আজ তোর মৃত্যু সুনিশ্চিত।"

এই বলিয়া চক্ষুর নিমিষে মেঘনাদ যজ্ঞোপকরণ কোষাকোষি তুলিয়া ভীমবেগে লক্ষ্মণের মস্তক লক্ষ্য করিয়া ছুড়িয়া মারিলেন। লক্ষ্মণ বাতাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় সেই প্রচণ্ড আঘাতেই ধরাশায়ী হইলেন।

ইন্দ্রজিৎ তখন লম্ফ দিয়া অস্ত্রাগার অভিমুখে গমনোন্মুখ হইলেন। কিন্তু দ্বারদেশে সশস্ত্র বিভীষণকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কহিলেন,—"হায়! এতক্ষণে বুঝিলাম,—লক্ষ্মণ কিরূপে

এই নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে! হায়, তাতঃ, এ কাজ কি আপনার শোভা পায়? তস্করকে আপনার গৃহে প্রবেশাধিকার দেওয়া কি বুদ্ধিমানের কার্য্য? লঙ্কেশ্বর আপনার সহোদর—আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র ইন্দ্রজিৎ; তাঁহাদিগের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে আপনার কি কিছুমাত্রও লজ্জা বোধ হইল না? কিন্তু দেব, আপনি আমার পিতৃতুল্য পরম গুরু,—আপনাকে তিরস্কার করা আমার অনুচিত। একবার দ্বার ছাড়িয়া দিন। অস্ত্রাগার হইতে সুসজ্জিত হইয়া আসি। আপনি দেখিবেন,—আপনার ভ্রাতৃপুত্র কত বড় বীর।"

বিভীষণ ভ্রাতুষ্পুত্রের এবম্বিধ উক্তিতে লজ্জিত হইলেন। কহিলেন,—"বৎস, তোমার এই অনুরোধ বিফল। আমি রামের আজ্ঞাবহ দাস। রামের বিপক্ষতা আমার সাধ্যাতীত।"

মেঘনাদ কহিলেন,—"তাতঃ, আপনার কথায় আশ্চর্য্য হইলাম। আপনি রামের দাস, এ কথা কহিতে আপনার কি বিন্দুমাত্রও সঙ্কোচ বোধ

হইল না ? কোথায় স্বর্ণলঙ্কার অধীশ্বর রাবণ,—আর কোথায় বনবাসী রামচন্দ্র ! কোথায় আত্মীয় স্বজন ও জ্ঞাতিবান্ধবগণের সহিত ঘনিষ্ঠতা, আর কোথায় পরকীয় সংশ্রব ! আপনি এই স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া বৃদ্ধ হইয়াছেন। আপনি আমার পিতার সাক্ষাৎ ভ্রাতা, আপনি পিতৃব্য হইয়া কিরূপে ভ্রাতৃপুত্রের বধসাধনে নিযুক্ত হইয়াছেন ? আপনি যখন স্বজনকে ত্যাগ করিয়া অপরের দাস্যবৃত্তিতে দিনপাত করিতেছেন, তখন আপনি সর্ব্বথাই নিন্দনীয় !

"তাতঃ, জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও জাতীয়তা কি আপনার একেবারেই লোপ পাইয়াছে ? পর যদি গুণবান্ এবং স্বজন যদি নির্গুণ হয়, তাহা হইলেও নির্গুণ স্বজন ব্যক্তি পর অপেক্ষা প্রধান। কেন না, পর চিরদিনই পর। আপনি শিথিলবুদ্ধিপ্রযুক্ত এতদুভয়ের বৈষম্য বুঝিতে পারিতেছেন না। বর্ব্বর বানরগণের সঙ্গে মিশিয়া আপনার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে দেখিতেছি ! আপনি স্থির জানিবেন, যে ব্যক্তি

স্বপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া পরপক্ষের আশ্রয় লয়, স্বপক্ষ বিনষ্ট হইলে সে পরপক্ষেরও অপ্রীতিকর হয়। পিতৃব্য, আপনি কিরূপে আমাদিগের আপনার জন হইয়া আজ আমাদিগেরই অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করিতেছেন ?”

রাবণানুজ বিভীষণ মেঘনাদের এবম্বিধ উক্তিতে বিশেষ লজ্জিত হইয়া কহিলেন,—“বৎস, আমাকে বৃথা ভৎর্সনা করিতেছ। লঙ্কেশ্বর নিজ কর্ম্মদোষেই আজ সবংশে মজিতে বসিয়াছেন। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন,—যে ব্যক্তি পরস্ত্রী ও পরধনাপহারী তাহাকে প্রজ্বলিত গৃহের ন্যায় ত্যাগ করিবে। বৎস, আজ পিতার দোষেই তোমার ন্যায় নিরপরাধ পুত্র মরিতে বসিয়াছে !”

পিতৃনিন্দা শুনিয়া মেঘনাদ মহা কুপিত হইলেন। বিভীষণকে জড়াইয়া ধরিয়া তিনি যেমন তাঁহাকে উত্তরীয় পাশে বন্ধন করিতে যাইতেছেন, অমনই লক্ষ্মণ মায়ার কৃপায় চেতনা লাভ করিয়া ধনুতে এক সুতীক্ষ্ণ শর যোজনা করিলেন এবং সেই মারাত্মক

শর মেঘনাদের বক্ষদেশ লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। বাণ-মুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল। চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে সেই ভীষণ বজ্র-বাণ মেঘনাদের বক্ষ বিদ্ধ করিল।

মেঘনাদ সেই ভীষণ শরাঘাতে ভূপতিত হইয়া পড়িলেন। সমগ্র লঙ্কা কাঁপিয়া উঠিল। সহসা রাবণের মস্তক হইতে কনক-মুকুট খসিয়া পড়িল। রাণী মন্দোদরীর বা চক্ষু যেন সহসা স্পন্দিত হইয়া উঠিল। প্রমীলার সেই সুন্দর ললাটের সিন্দুর কৌটাটী সহসা তাঁহার হস্তের সঙ্গে উঠিয়া আসিল!

মেঘনাদ লক্ষ্মণের সেই শরাঘাতে ভূপতিত হইয়া কাতরকণ্ঠে কহিলেন,—"রে বীরকুলগ্লানি সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ, মেঘনাদ মৃত্যুভয় করে না। কিন্তু তোর এবম্বিধ অন্যায় যুদ্ধে যে আজ প্রাণ ত্যাগ করিলাম, এ দুঃখ আর কখনই ভুলিতে পারিব না। বিধাতা তোর ন্যায় নরাধমের হস্তে যে আমার মৃত্যু লিখিয়া রাখিবেন, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। তুই যেরূপ অন্যায় যুদ্ধে আজ আমায় নিহত করিলি,

তাহাতে কস্মিন্ কালেও তোর এ কলঙ্ক অপনোদিত হইবে না। কিন্তু রে পামর, আমাকে না হয় মারিলি, কিন্তু স্থির জানিস্ যে পিতার হস্তে তোর আর উদ্ধার নাই। স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালের কোথাও এমন স্থান নাই যে তুই লঙ্কেশ্বরের দৃষ্টি এড়াইয়া থাকিতে সক্ষম হইবি। পুত্রশোকাতুর রাক্ষসরাজের ক্রোধানলে তুই মুহূর্ত্তেই ভস্মীভূত হইবি।”

মেঘনাদ আর অধিক কথা বলিতে পারিলেন না। তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। ক্ষত মুখে প্রবল রক্তস্রোত ছুটিল। যুবরাজ পরম ভক্তির সহিত জনক-জননীর পাদপদ্ম স্মরণ করিলেন এবং প্রাণাধিকপ্রিয়তমা প্রেমময়ী পত্নী প্রমীলার নিকট অন্তিম মানস-বিদায় গ্রহণ করিয়া দুই চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

পত্নীর বিদায়কালীন করুণ মুখচ্ছবি স্মরণ করিয়া মেঘনাদের মুদ্রিত চক্ষু হইতেও দর দর ধারায় অশ্রু পড়িতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে অশ্রুবেগ প্রশমিত হইল। যুবরাজের প্রাণ বায়ু

বহির্গত হইয়া গেল ! যুবরাজের সোনার শরীর রক্ত প্রবাহে ভাসিতে লাগিল। সান্ধ্যাকাশের রক্ত-রাগ-রঞ্জিত মেঘপুঞ্জের মধ্যে কিছুক্ষণ ভাসিয়া ভাসিয়া সোনার সূর্য্য ডুবিয়া গেল !

রাক্ষসরাজ রাবণের মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ লঙ্কার গৌরব-রবি চিরকালের জন্য অস্তমিত হইল !



একাদশ পরিচ্ছেদ



শক্তিশেলে লক্ষ্মণ

মেঘনাদের এই শোচনীয় অকাল মৃত্যুতে কৈলাসে দেবী ভগবতী আজ মহা বিষাদিতা। সতী শিবকে সম্বোধন করিয়া কাতর কণ্ঠে কহিলেন,—"প্রভু, যজ্ঞাগারে মেঘনাদ লক্ষ্মণের হস্তে নিহত হইয়াছে! হায়, আমার পরমভক্ত রাবণের এই দুঃখ কিছুতেই আমার প্রাণে সহিতেছে না। এই পুত্রশোক আজ রাবণের পক্ষে বড়ই অসহ্য হইবে। আপনি ইন্দ্রকে বর দিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছেন। আজ্ঞা করুন,—আমি আজ রাবণের এ শোক কথঞ্চিৎ প্রশমিত করি। রাক্ষস রণদূতেরা কেহই আজ রাবণকে মেঘনাদের মৃত্যু সংবাদ দিতে সাহসী হইতেছে না। নন্দীকে এখন লঙ্কায় প্রেরণ করিয়া রাবণকে এ সংবাদ দান করিবার ব্যবস্থা করুন প্রভু।"

শিব কহিলেন,—"সতি, মেঘনাদের মৃত্যু-সংবাদ আজ আমার এই হস্তস্থিত ত্রিশূলের আঘাত অপেক্ষাও আমার নিকট গুরুতর বলিয়া অনুভূত হইতেছে। কিন্তু তোমায় পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহা রাবণেরই কর্ম্মফল! দেবি, রাবণকে এই ভীষণ সংবাদ শুনাইলে সে প্রাণে বাঁচিবে কিনা না সন্দেহ। তাঁহাকে এই শোক সহ্য করিবার ক্ষমতা দাও। আর এক কথা, পুত্রশোকাতুর রাবণের ক্রোধাগ্নি হইতে আজ আর কাহারও রক্ষা নাই দেখিতেছি। রামলক্ষ্মণকে কিরূপে রক্ষা করা যায় তাহাই আমি চিন্তা করিতেছি।"

সতী কহিলেন,—"দেব, নন্দীকে এখনই রাক্ষস-দূতবেশে লঙ্কায় প্রেরণ করুন। পুত্রহত্যার প্রতিশোধ না লওয়া পর্য্যন্ত রাক্ষসরাজের ক্রোধ কিছুতেই প্রশমিত হইবেনা। বরং তাহার সেই মহাক্রোধানলে সমুদায় সৃষ্টি ধ্বংস হইবে। প্রভু, রাবণ আজ পুত্রের নিধনবার্ত্তা শুনিয়াই পুত্রহন্তাকে মারিবার জন্য যুদ্ধ যাত্রা করিবে এবং লক্ষ্মণকে

শরাঘাতে মৃতকল্প করিবে। আপনি লক্ষ্মণের প্রাণ বাঁচাইবার উপায় বিধান করুন। লক্ষ্মণ যেমন অন্যায় সমরে মেঘনাদের প্রাণনাশ করিয়াছে, তাহাতে ইহাই এক্ষণে লক্ষ্মণের সমুচিত দণ্ড। আমি অদ্যকার যুদ্ধ হইতে আমার পরম ভক্ত রাবণকে কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিব না। আর লক্ষ্মণকে মৃতকল্প না করিলেও রাবণের শোক প্রশমিত হইবে না।"

শিব উত্তর করিলেন,—"দেবি, তোমার এই পরামর্শই আমি গ্রহণ করিলাম। আমি দৈববাণী দ্বারা রামচন্দ্রকে লক্ষ্মণের প্রাণ রক্ষার উপায় বলিয়া দিব। দুর্গে, দেখিও রাক্ষসরাজ যেন লক্ষ্মণকে মৃতকল্প করিয়াই যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগমন করে।"

এই বলিয়া শিব নন্দীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন—"বৎস, ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণের হস্তে নিহত হইয়াছে। কিন্তু রাক্ষসদূতগণের কেহই লঙ্কেশ্বরকে এসংবাদ দিতে প্রাণে সাহস পাইতেছে

না। তুমি এখনই রাক্ষসদূতরূপে লঙ্কাপুরে গমন করিয়া রাক্ষসরাজকে এসংবাদ জ্ঞাপন কর। আর তাহাকে যুদ্ধার্থ উত্তেজিত করিয়া তাহার পুত্র-শোক কথঞ্চিৎ পরিমাণে প্রশমিত কর।"

নন্দী তথনই আকাশপথে লঙ্কা যাত্রা করিল। লঙ্কায় উপনীত হইয়া নন্দী রাক্ষস রণ-দূতের বেশে রাবণের রাজসভায় প্রবেশ করিল।

রাবণ তাহাকে দেখিয়া কহিলেন,—"দূত, আজিকার যুদ্ধের সংবাদ কি? যুবরাজ ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন কি?"

ছদ্মবেশী নন্দী উত্তর করিল,—"মহারাজ, আমি ক্ষুদ্র জীব, আমি আজিকার যুদ্ধের সেই অমঙ্গল বার্ত্তা আপনি অভয় দান না করিলে বলিতে পারিতেছি না।"

রাক্ষসরাজ দূতের কথায় প্রাণে শিহরিয়া উঠিলেন। দূতকে অভয় দিয়া কহিলেন,—"দূত, লোকের শুভাশুভ বিধাতারই অলঙ্ঘনীয় বিধান। তুমি নির্ভয়ে যুদ্ধ সংবাদ বিবৃত কর।"

তখন রণ-দূতবেশী নন্দী করযোড়ে কহিল—"মহারাজ লঙ্কার পঙ্কজ রবি মেঘনাদ যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণের হস্তে নিহত হইয়াছেন।"

রাক্ষসরাজ এসংবাদ শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া সেই স্বর্ণসিংহাসন হইতে পড়িয়া গেলেন। সভার সচিববৃন্দ হাহাকার করিতে লাগিলেন। সকলের সেবা-শুশ্রূষার কিছুক্ষণ পরে রাবণের চৈতন্যোদয় হইল। রাবণ শোকাবেগে কহিলেন,—"দূত, প্রাণাধিকপ্রিয় বীরপুত্র ইন্দ্রজিৎ কোথায় কিরূপে নিহত হইল, সে বৃত্তান্ত আমাকে বিশেষরূপে বিবৃত কর।"

দূত করযোড়ে কহিল,—"মহারাজ, যুবরাজ, নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ইষ্ট দেবতার অর্চ্চনায় নিরত ছিলেন, এমন সময় লক্ষ্মণ বিভীষণকে সঙ্গে করিয়া ছদ্মবেশে সেস্থানে উপস্থিত হইয়া অন্যায় সমরে তাঁহাকে বধ করিয়া প্রস্থান করিয়াছে। রাজন্, এখন পুত্র-হন্তার প্রতিশোধ লইয়া এই পুত্রশোক বিস্মৃত হউন।"

এই বলিয়া ছদ্মবেশী নন্দী সহসা রাজসভা হইতে অদৃশ্য হইল। আকাশ পথে এক উজ্জ্বল বিদ্যুৎপ্রভা ফুটিয়া উঠিল। রাক্ষসরাজ ইহা দেব-লীলা বলিয়াই বুঝিতে পারিলেন। কহিলেন,—“দেব, এতদিনে কি এই অভাগারে মনে পড়িল! যাহা হউক, এখন তোমার আদেশই প্রতিপালন করিব। পরে মনে যাহা আছে, ও চরণে নিবেদন করিব।”

এই বলিয়া রাক্ষসরাজ রাক্ষস সৈনিকদিগকে রণসজ্জায় সজ্জিত হইবার জন্য আদেশ দান করিলেন। কহিলেন,—“রণ-রঙ্গে আজি পুত্রশোক বিস্মৃত হইব। সত্বর রথ সাজাইয়া আন।”

লঙ্কেশ্বর সভা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। অস্ত্রাগারে গিয়া তিনি যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হইয়া বহির্গত হইলেন। রাক্ষসরাজের সেই বীরসজ্জা দেখিয়া রাক্ষসসৈন্যগণ মহা গর্জ্জন করিতে লাগিল। সকলেই রাবণের জয়ধ্বনিতে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল।

রাবণ রথের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় সম্রাজ্ঞী মন্দোদরী সখী দল সঙ্গে ক্রন্দন করিতে করিতে আসিয়া স্বামীর পদতলে মূর্চ্ছিতা-প্রায় হইয়া পড়িলেন।

রাক্ষসরাজ সযত্নে রাণীকে তুলিয়া লইয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। কহিলেন,—"রাণি, আমাদের প্রতি বিধি বিরূপ হইয়াছেন, তাই আজ আমাদের এ দশা! তবে যে আমি এখনও বাঁচিয়া আছি,—সে কেবল পুত্রহন্তার প্রতিশোধ লইবার জন্য। যাও দেবি, তুমি তোমার শূন্য ঘরেই ফিরিয়া যাও,—বধূমাতার দিকে গিয়া দৃষ্টিপাত কর। আমি যুদ্ধযাত্রী—আমাকে আর এখন বাঁধা দিও না। বিলাপ করিবার যথেষ্ট সময় পাইব। যে ক্রোধাগ্নি আজ হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইয়াছে,—তোমার অশ্রুজলে তাহা আর নির্ব্বাপিত করিও না। লঙ্কার গৌরব-রবি অস্তমিত হইয়াছে! পুত্রহন্তাকে শমন ভবনে প্রেরণ করিয়া আসিয়া তারপর পুত্রের জন্য কাঁদিতে বসিব। সতি, সমস্ত রাজ্যসুখে জলাঞ্জলি

দিয়া অতঃপর আমরা প্রিয় পুত্রের স্মৃতিতর্পণ করিব! যাও সতি,—এক্ষণে গৃহে ফিরিয়া যাও।”

এই বলিয়া রাক্ষসরাজ রথারোহণ করিলেন। সৈন্যগণ আবার ভীষণ গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

সারথি রণক্ষেত্রের দিকে রথ চালনা করিল। সখীরা পুত্র শোকাতুরা মন্দোদরীকে ধরিয়া তুলিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

রাবণের সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া রামের সৈন্যগণ রণে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। রাবণের রথ রামের শিবিরের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। রামচন্দ্র ধনুর্ব্বাণ হস্তে যুদ্ধ কবিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র রাক্ষসরাজের ভীষণ যুদ্ধে মহা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন।

রাবণ সারথিকে কহিলেন,—“দুরাত্মা লক্ষণের নিকট রথ লইয়া যাও।” সারথি রাজাদেশ প্রতিপালন করিল।

রাবণ লক্ষ্মণকে দেখিয়া কহিলেন,—“রে পাপাত্মা লক্ষ্মণ, এতক্ষণে তোকে পাইয়াছি।

দেখ্, তোকে আজ কে রক্ষা করে ? তোর মৃত্যু আজি সন্নিকট। অন্তিমকালে এখন তোর ইষ্ট-দেবতাকে একবার স্মরণ কর্।”

এই বলিয়া রাক্ষসরাজ এক ভীষণ শেল লক্ষ্মণের বক্ষদেশ লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। শরাঘাতে লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ ভূতলশায়ী হইলেন। রাবণ তখন রথ হইতে অবতরণ করিয়া খড়্গ হস্তে লক্ষ্মণের দিকে ধাবমান্ হইলেন। কিন্তু সহসা তাঁহার কানে কানে কে যেন কহিল,—“লক্ষ্মণ মরিয়াছে,—খড়্গাঘাতে আর নিষ্প্রয়োজন।”

রাবণ কি ভাবিয়া আবার রথারোহণ করিলেন। সারথিকে রাজধানীর দিকে রথ চালনা করিতে আদেশ দান করিলেন। রাক্ষসসৈন্যগণ সোল্লাসে রাবণের জয়-ধ্বনি করিতে লাগিল।

শ্রীরামচন্দ্র মৃতকল্প লক্ষ্মণকে লইয়া করুণকণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিলেন। সহসা এক দৈববাণী হইল,—“গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে বিশল্যকরণী নামক মহৌষধ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে আনয়ন করিয়া

যদি আহত স্থানে প্রদান করিতে পার, তবে লক্ষ্মণের জীবন লাভ হইবে।”

হনূমান তখনই ঔষধ আনিবার জন্য গন্ধমাদন পর্ব্বতাভিমুখে বায়ুবেগে যাত্রা করিল। সেই পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া হনূমান ঔষধের নাম ভুলিয়া গেল। বীর হনূমান তখন সমস্ত পর্ব্বতটী মস্তকে লইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে আসিয়া রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইল।

লক্ষ্মণ সেই মহৌষধি গুণে বাঁচিয়া উঠিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের আনন্দের আর সীমা রহিল না।



দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শ্মশান-শয্যায় দম্পতী।



প্রমীলা তাঁহার অন্তঃপুরস্থ একটী সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে উপবিষ্টা। সতী আজ কত কি চিন্তা করিতেছেন। প্রমীলার সেই হাস্যোৎফুল্ল সুন্দর মুখ খানি আজ বড়ই চিন্তা-ক্লিষ্ট।

প্রমীলার অদৃষ্টে যে নিদারুণ বজ্রাঘাত হইয়াছে,—সতী তখনও তাহা জানিতে পারেন নাই। যুবরাজের সেই নিভৃত অন্তঃপুরে তখনও সেই ভীষণ সংবাদ পৌঁছে নাই। এই ভীষণ সংবাদ সতীকে কে শুনাইবে?

প্রমীলা মেঘনাদের সঙ্গে যজ্ঞাগারে যাইতে না পারিয়াই প্রাণে বড় ক্ষুণ্ণা হইয়াছেন। পতিপ্রাণা সতী পতির মঙ্গলকামনায় আজ বাসন্তীকে লইয়া

মায়ের মন্দিরে গিয়া ভবানীর চরণে কতবার যে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আসিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার প্রাণটা শান্ত হইতেছিল না।

যে পতির বিচ্ছেদ ব্যথা সহ্য করিতে না পারিয়া কাল গভীর নিশীথে তিনি সুদূর দ্বীপান্তর হইতে লঙ্কায় চলিয়া আসিলেন, আজ সেই বিরহ ব্যথায়ই আবার তাঁহাকে আকুলা হইতে হইতেছে। প্রমীলা স্বামীর মঙ্গলকামনায় আজ সমস্ত দিন শিবপূজা করিবেন বলিয়া মনস্থ করিলেন। বেলা প্রহরেকের সময় প্রমীলা স্নান করিতে গেলেন।

স্নানান্তে সতী বেশবিন্যাস করিতেছেন,—কিন্তু আজ সহসা তাঁহার দক্ষিণ হস্তের রত্নমণ্ডিত শাঁখা গাছটী যেন কেমন করিয়া ভাঙ্গিয়া গেল! কণ্ঠহার যেন প্রমীলার কণ্ঠকে বড়ই পীড়া দিতে লাগিল। কি এক অস্ফুট ক্রন্দন ধ্বনি সাধ্বীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার হৃদয়কে যেন অধিকতর আকুল করিয়া তুলিল।

প্রমীলা বিবিধ অমঙ্গল চিহ্ন দর্শন করিতে লাগিলেন। ব্যাকুলহৃদয়ে সখীকে কহিলেন,—"সই, আমি দূরে যেন কিসের হাহাকার ধ্বনি শুনিতে পাইতেছি। আমার বাম চক্ষুও স্পন্দিত হইতেছে। গায়ের অলঙ্কার গুলিও আজ আমার নিকট যেন কেমন অপ্রীতিকর বোধ হইতেছে। বাসন্তী, যজ্ঞাগারে না জানি প্রাণনাথের কি বিপদ সমুপস্থিত। তুমি শীঘ্র যজ্ঞাগারে যাও। প্রাণনাথকে বলিয়া এস,—আজ যেন তিনি যুদ্ধে না যান। আমি নানাবিধ অমঙ্গল চিহ্ন দর্শন করিতেছি। যুবরাজকে বলিও,—প্রমীলার শত শত অনুরোধ আজ তুমি যুদ্ধে যাইও না।"

বাসন্তী কহিলেন,—"সই, আমার কথা যুবরাজ শুনিবেন কি ? চল, আমরা রাণীমার কাছে যাই,—রাণীমা নিষেধ করিলে হয়ত যুবরাজ আজিকার যুদ্ধ হইতে বিরত হইবেন।"

প্রমীলা কহিলেন,—"সই, আমার প্রাণ বড়ই আকুল হইতেছে, তুমি মার নিকট গিয়া বল,—

যুবরাজকে তিনি এই কুদিনে যুদ্ধযাত্রা করিতে যেন নিষেধ করিয়া পাঠান। সই, শীঘ্র যাও,—তিনি কি বলেন,—জানিয়া আইস।”

প্রমীলার অগ্রহাতিশয্যে বাসন্তী রাণী মন্দোদরীর গৃহে গমন করিলেন। গিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। দেখিলেন,—রাণী উন্মাদিনীর ন্যায় ধূলি-বিলুণ্ঠিতা হইয়া কপালে করাঘাত পূর্ব্বক পুত্র-শোকে রোদন করিতেছেন। বাসন্তীর আর পা চলিল না। বাসন্তী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলেন।

কতিপয় পরিচারিকার শুশ্রূষায় বাসন্তী চৈতন্য লাভ করিলেন। বাসন্তীর দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রুরাশি গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। বাসন্তী পরিচারিকা গণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে,—লক্ষ্মণ ও বিভীষণ গুপ্তভাবে যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিয়া অন্যায় যুদ্ধে যুবরাজকে নিহত করিয়া পলায়ন করিয়াছে। পুত্রশোকাতুর রাক্ষসরাজ পুত্রহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছেন।

বাসন্তী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া কিয়ৎকাল বসিয়া রহিলেন। অতঃপর ধীরে ধীরে উঠিয়া দুই জন পরিচারিকার সঙ্গে প্রমীলার গৃহপানে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

প্রমীলা বাসন্তীর জন্য উন্মুখ হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় দেখিলেন,—বাসন্তী দুইজন পরিচারিকা সহ তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। প্রমীলা বাসন্তীর বিলম্বের জন্য তাঁহাকে তিরস্কার করিতে যাইতেছেন, কিন্তু বাসন্তীর সেই বিষাদক্লিষ্ট মুখচ্ছবি দেখিয়া কি ভাবিয়া যেন থামিয়া গেলেন।

প্রমীলা দেখিলেন,—বাসন্তীর সেই পূর্ণায়ত চক্ষুদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত, গোলাপফুলের ন্যায় সেই সুন্দর মুখ খানি প্রগাঢ় বিষাদমেঘে সমাচ্ছন্ন। সখীর মুখ দেখিয়া প্রমীলা শিহরিয়া উঠিলেন।

বাসন্তী সমীপবর্ত্তী হইবা মাত্র প্রমীলা কহিলেন, —“কি জানিয়া আসিলে সই? প্রিয়তমের সংবাদ কি সই?”

বাসন্তী সখীকে কি উত্তর দিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। বাসন্তীর নেত্রদ্বয় হইতে দর দর ধারায় অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

প্রমীলা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার উৎকণ্ঠা আরও বৃদ্ধি পাইল। সখীর একান্ত সমীপবর্ত্তী হইয়া, প্রমীলা আপনার সেই কচি-কোমল মৃণালভুজে সখী বাসন্তীর গলা জড়াইয়া ধরিলেন। কাতর কণ্ঠে কহিলেন,—"প্রাণের সই, আমায় আর জীবন্মৃত করিয়া ফল কি সই? কি হইয়াছে,—একবার খুলিয়া বলনা সই।"

বাসন্তীর উদ্বেলিত অশ্রু আর রোধ মানিল না। বাসন্তীর চক্ষে জল দেখিয়া প্রমীলার চক্ষু হইতেও অশ্রুরাশি গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

বাসন্তী দুই হস্তে প্রমীলার গলা বেষ্টন করিয়া শোকভারাক্রান্ত হৃদয়ে কহিলেন,—"সই, সেই সংবাদ কেমন করিয়া কহিব সই? আমাদের কপাল পুড়িয়াছে—লঙ্কার গৌরব-রবি আজ

ঊষার আকাশেই অস্তমিত হইয়াছে।” এই বলিয়া বাসন্তী উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

বাসন্তীর এই রোমহর্ষণ সংবাদে প্রমীলার অশ্রুধারা সহসা শুকাইয়া গেল। প্রমীলা নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় কিয়ৎকাল স্থির হইয়া দাড়াইয়া রহিলেন; পরে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলেন। সখীরা শশব্যস্তে সতীর শুশ্রূষায় নিযুক্তা হইলেন। বহুক্ষণ পরে প্রমীলা নয়ন উন্মীলন করিলেন। তাঁহার নয়নে আর সে জ্যোতি নাই,—অধরে হাস্য নাই—মুখে বাক্য নাই। প্রমীলার সেই ভয়াবহ অবস্থা দেখিয়া সখীরা ভীতা হইলেন। বাসন্তী কহিলেন,—“সই, আমাদের সঙ্গে কথা কও না সই!”

প্রমীলা তথাপি নীরব—নিরুত্তর রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে প্রমীলা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বাসন্তীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“প্রাণনাথ কোথায় সই? চল্, আমি তাঁহাকে আর একবার দেখিব। আমাকে একবার সেখানে লইয়া চল্ সই।”

বাসন্তী কহিলেন,—"সেখানে গিয়া আর কি দেখিবে সখিমণি আমার! সেখানে দেখিবারই বা আর কি আছে! যুবরাজের প্রাণহীন দেহ পড়িয়া রহিয়াছে মাত্র! সই, যুবরাজ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ইষ্টদেবতার অর্চ্চনায় নিরত ছিলেন, দুরাত্মা লক্ষ্মণ ও বিভীষণ গুপ্তভাবে সেখানে প্রবেশ করিয়া অন্যায় যুদ্ধে যুবরাজকে হত্যা করিয়া পলায়ন করিয়াছে। সই, তোমার অন্তরের ব্যথা মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিয়া যাও। চল,—আজ আমরা এই অন্যায় যুদ্ধের প্রতিশোধ লই। তোমার ঐ রণ-রঙ্গিণী ভৈরবী মূর্ত্তি আজ আর একবার দেখাও না সই? পতিই ত সতী নারীর একমাত্র গতি। সখি, আজ তুমি তোমার ঐ পতিহন্তার তপ্তরক্তে তরবারী রঞ্জিত করিয়া হৃদয়ের তীব্র জ্বালা নিবারণ কর। তুমি বলত আমরা এখনই যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হই। তোমার কি অভিপ্রায় বল না সই?"

প্রমীলা বিষাদ-গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—"না সই,—আর অস্ত্র ধরিয়া কি লাভ হইবে? পতিহন্তাকে

বধ করিলে আমার প্রাণেশ্বরকে কি আর ফিরিয়া পাইব সই ? যদি ফিরিয়া পাওয়া যাইত সই,—তবে সমগ্র বিশ্ব আজ আর একবার সতী নারীর তেজ দেখিয়া চমকিত হইত। কিন্তু তাহাত আর পাইব না সই ! হায়, সেই পতিকেই যদি ইহজীবনে আর না পাইলাম, তবে আর প্রতিহিংসা সাধন করিয়া কি হইবে সই ? নারী হইয়া অপর এক নারীর হৃদয়ে আগুন জ্বালাইয়া আমার কি লাভ হইবে সই ? নারীর কষ্ট আজ নারী বুঝিতে শিখুক ! পতিহন্তার রক্তে তরবারী রঞ্জিত করিয়া আমাদের কিছুই লাভ হইবে না, বরং উহাতে এক হতভাগিনী রমণীকে চিরকালের জন্য অকূল সাগরে ভাসাইয়া যাইব। তাই বলি,—সই, নারীর বেদনা নারী আজ বুঝিতে শিখুক। আর নির্ম্মম নরঘাতকেরা নারীজাতির এই জ্বলন্ত দৃষ্টান্তে বিস্ময়ান্বিত হইয়া আপনাদিগকে শতবার ধিক্কার প্রদান করুক। পৃথিবীর সমস্ত নর-নারী আজ বিস্ময়বিমুগ্ধনেত্রে চাহিয়া দেখুক,—পতিহারা

প্রমীলা আজ তাহার পতিহন্তার কোনরূপ প্রতিশোধ লওয়া দূরের কথা, সে আজ অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহাকে ক্ষমা করিয়া, তাহার একমাত্র অবলম্বন সেই পতিরই অনুগামিনী হইতেছে।”

বাসন্তী, সখীর কথায় শিহরিয়া উঠিলেন।

প্রমীলা বাসন্তীর ভাব দেখিয়া কহিলেন,—“বাসন্তী, তুই আমার কথায় শিহরিয়া উঠিতেছিস্ কেন সই? তুই-ই ত বলিয়াছিস্,—পতি বিনা সতীর আর কি গতি আছে সই? তুই আমায় শীঘ্র একবার যজ্ঞাগারে লইয়া চল্, আমি নাথকে ছাড়িয়া আর মুহূর্ত্তমাত্রও থাকিতে পারিতেছিনা।” এই বলিয়া প্রমীলা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আলুথালুবেশে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারের দিকে ধাবমানা হইলেন। বাসন্তী প্রভৃতি সখীরাও পতিবিয়োগ-বিধুরা আলুলায়িতকুন্তলা পাগলিনীপ্রায় প্রমীলার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিতা হইলেন।

প্রমীলা সখীগণের সঙ্গে যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন যুবরাজ যেন সহাস্যমুখে

নিদ্রামগ্ন রহিয়াছেন! বাসন্তী যুবরাজের মস্তকটী সযত্নে আপনার ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন, দেখিলেন সে দেহে আর প্রাণ নাই। অশ্রুজলে বাসন্তীর বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। উন্মাদিনা প্রমীলা একদৃষ্টে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পতির মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অতঃপর আপনার পরিধেয় অলঙ্কারগুলি একে একে উন্মোচন করিয়া সখীদিগের হস্তে দিয়া কহিলেন,—"এই অলঙ্কারগুলি দুঃখিনী দরিদ্রা দিগকে দান করিও।"

অতঃপর প্রমীলা প্রিয়সখী বাসন্তীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"আমায় এখন বিদায় দাও সই! তুমিই আমার ইহজীবনের নিত্যসঙ্গিনী ছিলে,— আজ তোমায় ছাড়িয়া যাইতেছি বলিয়া আকুলা হইও না,—সখিমণি আমার! তোমার স্নেহে— তোমার সেবাযত্নে, মুহূর্ত্তের জন্যও কোন দিন কিছুর অভাব বোধ করি নাই। আমায় হাসি মুখে আজি বিদায় দাও সই। তোমার মুখ বিষন্ন

দেখিয়া মরিলে আমার আজিকার মরণ সুখের হইবে না। সই,—স্বামী বলিয়াছিলেন,—মৃত্যুতেও সুখ আছে—মৃত্যুতেও গৌরব আছে। তিনি আজ সেই গৌরবই লাভ করিয়াছেন। সই, পতির সঙ্গে সতীর মরণেও সুখ আছে—গৌরব আছে। আমার এ মরণ-সুখে আজ তোমরা বাঁধা দিওনা,—যদি স্বর্গ থাকে—যদি সতীর কথা মিথ্যা না হয়, তবে নিশ্চয় জানিও পরলোকে আবার তোমায় সঙ্গিনী পাইয়া কৃতার্থা হইব। সই, দৈত্যপুরে গিয়া পিতা-মাতাকে আমার সংবাদ দিও এবং তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিও। তাঁহাদিগকে কহিও,—তাঁহারা যাঁহার হস্তে আমাকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন, আজ তাঁহারই মৃত্যুতে তাঁহার সঙ্গে আমি স্বর্গ যাত্রা করিলাম। পতি বিনা অবলার আর কি গতি আছে সই ?”

এই বলিয়া প্রমীলা পতির পদতলে ভক্তি ভরে একবার প্রণাম করিলেন। তারপর মৃত পতির চরণ চুম্বন করিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

সখীরা প্রমীলার মূর্চ্ছাপনোদনে কত যত্ন চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। পতিপ্রাণা সতী পতির চরণ ধ্যান করিতে করিতে চির নিদ্রায় অভিভূতা হইলেন। প্রমীলার সখীগণের সকরুণ আর্ত্তনাদে লঙ্কার পশুপক্ষী পর্য্যন্ত ক্রন্দন করিতে লাগিল!

মেঘনাদের মৃত্যু-সংবাদ ইতঃপূর্ব্বেই লঙ্কাপুরীতে প্রচারিত হইয়াছিল। মেঘনাদের মৃত্যু জনিত হাহাকার থামিতে না থামিতেই প্রমীলার এইরূপ মৃত্যুসংবাদে সমগ্র লঙ্কায় আবার এক মহা হাহাকার পড়িয়া গেল। পতিগতপ্রাণা সতীকে দর্শন করিবার জন্য সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হইতে লাগিল। প্রমীলার সখীরা প্রমীলার ললাটে সিন্দুর লেপন করিয়া দিলেন এবং রাশি রাশি পুষ্পমালায় তাঁহার দেহ সুশোভিত করিলেন। মেঘনাদের মৃতদেহও পুষ্পদ্বারা আচ্ছাদিত করা হইল। দম্পতী মৃত্যু-শয্যায় এক অপূর্ব্ব শোভায় শোভান্বিত হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন।

রাক্ষসরাজ রাবণের পুত্রশোক কিঞ্চিন্মাত্র প্রশমিত হইতে না হইতেই তাঁহার কর্ণে আবার পুত্রবধূ প্রমীলার শোচনীয়-মৃত্যু সংবাদ পৌঁছিল। লঙ্কেশ্বর গভীর মনস্তাপে ধূলিবিলুণ্ঠিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

এদিকে শক্তিশেলাহত মৃতকল্প লক্ষ্মণ সেই হনূমান আনীত মহৌষধিগুণে পুনর্জ্জীবন লাভ করিলেন। রঘুসৈন্যগণের আনন্দ-কোলাহল ও জয়-জয়-নাদে আকাশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সেই আনন্দ-কোলাহল ভূলণ্ঠিত রাক্ষস-রাজের কর্ণকুহরেও প্রবেশ করিল। রাবণ মন্ত্রীর মুখে লক্ষ্মণের পুনর্জ্জীবন লাভের সংবাদ অবগত হইলেন। একদিকে পুত্র-পুত্রবধূর মৃত্যুজনিত শোক—অপরদিকে পুত্রহন্তা শত্রুর পুনর্জ্জীবনলাভ-জনিত কোলাহল তাঁহার হৃদয়কে একেবারে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল। রাক্ষসরাজ বুঝিলেন,—লঙ্কার গৌরব-রবি সত্য সত্যই অস্তমিতপ্রায়।

রাবণ পুত্র-পুত্রবধূর প্রেতকৃত্য সমাপনের জন্য মন্ত্রী দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের নিকট এক সপ্তাহ কাল

সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। রামচন্দ্র রাক্ষসরাজের এই মহা বিপদ্‌বার্ত্তায় মর্ম্মাহত হইলেন। প্রমীলার সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি আজিও তাঁহার প্রাণে অঙ্কিত রহিয়াছে। লঙ্কার পঙ্কজ-পঙ্কজিনী এই রাক্ষসদম্পতীর এবম্বিধ শোচনীয় মৃত্যুতে শ্রীরামচন্দ্রের হৃদয় ব্যথিত হইল। শ্রীরামচন্দ্র মহাবিপন্ন রাক্ষসরাজের এই কাতর প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। সপ্তাহের জন্য সংগ্রাম বন্ধ রহিল। রাক্ষসরাজ পুত্র-পুত্রবধূর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উদ্যোগ করিবার জন্য অমাত্যবর্গকে আদেশ প্রদান করিলেন।

এক প্রকাণ্ড রাজকীয় শোভাযাত্রা সহ লঙ্কাবাসী কাঁদিতে কাঁদিতে মেঘনাদ ও প্রমীলার শব দেহ লইয়া সমুদ্র তীরস্থ শ্মশান-ভূমিতে আসিয়া সমাগত হইলেন। লঙ্কেশ্বরও সেই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য পদব্রজে সমুদ্রতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সাগরকূলবর্ত্তী শ্মশানে মেঘনাদ ও প্রমীলার পবিত্র দেহ ভস্মীভূত করিবার জন্য চন্দন কাষ্ঠে এক চিতা সজ্জিত

হইল। দম্পতীর দেহ-যুগল সেই চিতার উপর পাশাপাশি স্থাপন করিয়া রক্ষোবীরগণ চিতার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন। প্রমীলার সঙ্গিনীগণের মর্ম্মন্তুদ হাহাকার ধ্বনিতে সেই মহাশ্মশান প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল!

রাক্ষসরাজ প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া সেই বিষাদ দৃশ্য বিলোকন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে চিতার দিকে অগ্রসর হইয়া মৃত পুত্র-পুত্রবধূকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"মেঘনাদ, আশা ছিল, তোমাকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া—তোমাকে সিংহাসনে বসাইয়া—তোমার সম্মুখে পরলোক যাত্রা করিব। ইচ্ছা ছিল,—তোমাকে ও বধূমাতাকে লঙ্কার রাজসিংহাসনে সমাসীন দেখিয়া প্রীতি লাভ করিব। হায়, আজ তাহার পরিবর্ত্তে আমার সম্মুখে তোমাদিগের এই শোচনীয় শ্মশান-শয্যা! হা বিধাতঃ! জানিনা কি অপরাধে আমায় এই ভীষণ দণ্ডে দণ্ডিত করিতেছ!"



রাক্ষসরাজ আর অধিক কথা বলিতে পারিলেন না,—এই কথা কয়টী বলিতে বলিতেই তিনি সেই শ্মশান সন্নিকটে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মন্ত্রিবর্গ বহু যত্নে রাক্ষসরাজের চেতনা সঞ্চার করিলেন।

চিতানল প্রজ্বলিত হইল। কৈলাসে ভক্তবৎসল মহাদেব মেঘনাদ ও প্রমীলাকে কৈলাসপুরীতে আনয়নের জন্য হুতাশনকে আজ্ঞা করিলেন। পরম পিতৃমাতৃভক্ত ও স্বদেশপ্রেমিক মেঘনাদ ও সতী সাধ্বী প্রমীলার ভৌতিক দেহ দেখিতে দেখিতে ভস্মীভূত হইয়া গেল। কিন্তু তাঁহাদিগের অমর আত্মা দিব্য দেহ ধারণ করিয়া দেব-রথে আরোহণপূর্ব্বক দেবলোকে প্রস্থান করিল।

রাক্ষসবৃন্দ দম্পতীর চিতাভস্ম সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিয়া দাহস্থান মন্দাকিনীর পূত সলিলে ধৌত করিলেন। অতঃপর দাহকারিগণ স্নান করিয়া চক্ষের জলে ভিজিতে ভিজিতে লঙ্কায় প্রত্যাগমন করিলেন। যুবরাজ-দম্পতীর এই শোচনীয় অকাল-মৃত্যুতে সাত দিন সাত রাত্রি পর্য্যন্ত লঙ্কার

হাহাকার আর থামিল না। মেঘনাদ ও প্রমীলার দেহ যে স্থানে ভস্মীভূত হইয়াছিল, সেখানে এক অপূর্ব্ব মঠ বিনির্ম্মিত হইল। রাবণের মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অকালে দুইটী অমূল্য জীবনের আহুতি হইয়া গেল!

[সমাপ্ত।]

